স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

৭২ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ১৮ মে, ২০২০।। ৪ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

রামায়ণ-মহাভারত ধারাবাহিক আজও সমান জনপ্রিয়

তেলেনিপাড়ায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ
— লকেট চট্টোপাধ্যায়
পৃঃ ১৫

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद है, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৮ মে - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

নিজামুদ্দিনের তবলিগিদের কাজকর্ম জেহাদেরই নামান্তর
▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৫

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রামায়ণ পর্যালোচনা : প্রতিবাদে তারাশঙ্কর
▯ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ▯ ৭

দূরদর্শনের রামায়ণ-মহাভারত একটি উপলব্ধি
▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১০

লকডাউনে ঘরবন্দি জেনারেশন জেডের নতুন আবিষ্কার
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১২

ভারতবর্ষ ▯ এস ওয়াজেদ আলী ▯ ১৪

তেলেনিপাড়ায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ : ইন্টারনেট বন্ধ করে সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা ▯ দীপ্তাশ্য যশ ▯ ১৫

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ উন্মোচিত হোক
▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ১৭

করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়তে দেশজুড়ে জেলা আধিকারিকদের বড় ভূমিকা
▯ ডাঃ দেবী শেঠী ও কিরণ মজুমদার শ' ▯ ২০

সম্পাদকীয়

তাণ্ডবকারীদের কঠোর হস্তে দমন করিতে বইবে

হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার পর হুগলির তেলেনিপাড়া। ক্রমশ বুঝা যাতিছে যে, এই রাজ্যের একটি বিশেষ সম্প্রদায় আইন ভঙ্গ করাকে নিজেদের অধিকার হিসাবে ভাবিয়া লইয়াছে। এবং নিত্যদিন আইন ভঙ্গের মাধ্যমে তাহারা তাহাদের পেশীশক্তির প্রদর্শন করিতেছে। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের মুসলমানদের একটি শ্রেণী লকডাউনকে কার্যত অমান্য করিতেছিল। পুলিশ তাহাদের এই অপচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে পুলিশকে তাহারা প্রহার করে, থানাতেও হামলা চালায়। অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে হুগলির তেলেনিপাড়াতে। তবে, তেলেনিপাড়ায় মুসলমান দুষ্কৃতীদের আক্রমণের শিকার হইয়াছে নিরীহ হিন্দুরা। হিন্দুদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর করা হইয়াছে। অগ্নিসংযোগও করা হইয়াছে। বেশ কিছু হিন্দু পরিবার আতঙ্কিত হইয়া এলাকা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তেলেনিপাড়ার এই তাণ্ডব শুধু তেলেনিপানায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই। রিষড়া ও চন্দননগরেরও কিছু অংশে তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র দেশ যখন করোনা নামক মারণ ভাইরাসের মোকাবিলায় ব্যস্ত, সেই সময় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের এই তাণ্ডব ইহাই প্রমাণ করে যে, সংকটের সময়ও ইহারা দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থ চিন্তা করে না। ইহাদের নিকট উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদই প্রাধান্য পায়। অন্য আর কিছু নহে। টিকিয়াপাড়া ও তেলেনিপাড়া শুধু নয়, এই লকডাউন পর্বে রাজ্যের আরও কিছু অংশে এই রকম আইন ভঙ্গ করিয়া গণ্ডগোল করিবার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। এবং প্রত্যেকটি ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠিয়াছে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে। এই সব হাঙ্গামার ঘটনায় প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা সর্বাধিক হতাশজনক। পুলিশ সর্বত্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিয়াছে। কোথাও কোথাও আক্রান্ত হিন্দুদেরই মিথ্যা অভিযোগে ধরপাকড় করিয়াছে। তেলেনিপাড়ায় ভারতীয় জনতা পর্টির স্থানীয় সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিতে গেলে তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছে। এমনকী জেলা শাসক সংসদ সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সৌজন্যটুকু পর্যন্ত দেখান নাই। টিকিয়াপাড়াতে তো পুলিশের উপর হামলাকরীর বাড়িতে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছাইয়া দিয়া তুষ্টিকরণের ঘৃণ্য নমুনা দেখাইয়াছে পুলিশ-প্রসাসন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভূমিকা কী এই সব ঘটনায়? আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর আচার আচরণ দেখিলে এবং কথাবার্তা শুনিলে কখনই মনে হয় না তিনি রাজ্যের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের মানুয়ের মুখ্যমন্ত্রী। বরং, যত দিন যাইতেছে, ততই তিনি যেন প্রমাণ করিতেছেন, তিনি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ত্রাতা হিসাবেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য তিনি অন্যায্য এবং অন্যায় কর্ম করিতেও দ্বিধা বোধ করিবেন না।

টিকিয়াপাড়া ও বালটিকুরির ঘটনাতেও দেখা গেল, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর হইবার পরিবর্তে, তিনি রাজ্যে তাঁহার রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি দোষারোপ করিতে ব্যস্ত রহিলেন। এবং পূর্বেও এই ধরনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই ধরনের আচরণই লক্ষ্য করিয়াছে রাজ্যের মানুষ।

কোনো ঘটনার জন্য একটি সমগ্র সম্প্রদায়কে দায়ী করা উচিত নহে। কেহ তাহা করিতেছেও না। কিন্তু ইহা কোনো প্রকারেই অস্বীকার করা যাইবে না যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ এদেশের যাবতীয় আইন কানুন ভঙ্গ করিতে বরাবরই বেশিমাত্রায় উৎসাহী। আসলে এই ধরনের আচরণের ভিতর দিয়া ইহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে, ভারত নামক রাষ্ট্রটির প্রতি তাহাদের কোনো আনুগত্যই নাই। তাহাদের যাবতীয় আনুগত্য আরবের ইসলাম দুনিয়ার প্রতি। এই দেশের তথাকথিত সেকুলার এবং বামপন্থী দলগুলির তোষণের রাজনীতির কারণে, মুসলমান সমাজের এই অংশটির মনোভাব ক্রমাগতই বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। করোনা সংকটের সময়েও আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতা এবং পাশ্ববর্তী মুসলমান এলাকাগুলিতে কঠোর ভাবে লকডাউন কার্যকর করিবার আগ্রহ প্রশাসন দেখায় নাই। বরং প্রথমাবধিই এই এলাকাগুলিতে লকডাউন অমান্য করিবার মানসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। তোষণের রাজনীতির কারণে প্রশাসন একদিনের জন্যও কঠোর হইতে পারে নাই। তাহারই ফলশ্রুতিতে টিকিয়াপাড়া, তেলেনিপাড়া।

করোনা সংকট একদিন দূর হইবে। লকডাউন একদিন পুরাপুরি উঠিয়া যাইবে। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রটিকে অমান্য করিবার এই মানসিকতা যদি দেশের ভিতর একটি সম্প্রদায়ের একাংশের রহিয়া যায়— তাহা হইলে দেশের অকণ্ডতা এবং নিরাপত্তার পক্ষে তা অশনি সংকেত হইয়া উঠিবে। অতএব, তোষণের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া এই মানসিকতাকে সমূলে উৎপাটিত করিতেই হইবে।

সুভাষিতম্

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবঃ তস্মাদ্ভাবো হি কারণম্।।

দেবতা কাঠে বাস করেন না, পাথরেও বাস করেন না, এমনকী মৃন্ময়ী মূর্তিতেও বাস করেন না। দেবতা হৃদয়েই বাস করেন। তাই হৃদয়ই হলো দেবতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ।

নিজামুদ্দিনের তবলিগিদের কাজকর্ম জেহাদেরই নামান্তর

হাসিনা সরকার যা করে দেখাতে পেরেছে, মমতা সরকার তা পারেনি। কারণ ভোটব্যাঙ্ক মুসলমান তুষ্টিকরণ। একদিন এ তুষ্টিরই কুফল ভোগ করতে হবে মমতার দলকে।... নিজামুদ্দিনের তবলিগিরা যখন তুলেছে জেহাদের জিগির, তখন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কারবারিরা একেবারে নিশ্চুপ। ৭০ বছরের সেকুরলারবাদের এটাই নির্মম পরিহাস।

ধীরেন দেবনাথ

ভারতে করোনা সংক্রমণের আবহে একটি ধর্মীয় জমায়েত যে কত বড়ো সর্বনাশ ঘটাতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ সম্প্রতি দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব তবলিগি ইসালামিক জলসা। ওই জলসা বা জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের অন্তত হাজার চারেক মোল্লা-মৌলবি, ইমাম-মৌলানা, হাজি-কাজি-গাজি-সহ অসংখ্য মানুষ। এছাড়াও ওই জলসায় উপস্থিত ছিলেন শ্রোতা হিসেবে দিল্লির বিভিন্ন মহল্লা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে আসা কয়েক হাজার মুসলমান। তবে যখন নিজামুদ্দিনে জমায়েতটি হয়েছে তখন বিশ্বজুড়ে করোনা বসিয়েছে মারণ থাবা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মতো রাজধানী দিল্লিতেও ছড়িয়ে পড়েছে করোনার বিষ। যেহেতু দিল্লির পুলিশ-প্রশাসন কেন্দ্রের হাতে, সেহেতু ওই জমায়েতের অনুমতি দিল্লি পুলিশই দিয়েছে। কিন্তু তখন এদেশে বিশেষত দিল্লিতে করোনা সংক্রমণ তেমন ঘটেনি। তাই জলসা চলাকালীন দিল্লিতে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসন অনুমতি বাতিলের নির্দেশিকা জারির কথা বললেও তাদের কথায়— উদ্যোক্তারা নির্দেশ অমান্য করে ধর্মসভা চালিয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, তাঁরা সভা বন্ধের কোনো নির্দেশিকা পাননি। আর দু'পক্ষের এই চাপান উতরের খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেতেই সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে ওঠে তর্কবিতর্কের ঝড়। বিরোধীদের প্রশ্ন, দিল্লির পুলিশ প্রশাসন সর্বনাশা করোনার সংক্রমণের কথা জেনেশুনেও কেন জলসা হতে দিল? তাঁরা এ নিয়ে সরকার পক্ষকে মূলত 'বলির পাঁঠা' বানিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের কথাকে তারা পাত্তাই দেয়নি। এ যেন 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'!

সত্যি বলতে কী, গণতান্ত্রিক দেশে এটাই দস্তুর। সরকারের ভুলত্রুটি ধরে দেওয়া বিরোধীদের কর্তব্য এবং সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু সরকারের জনস্বার্থে নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্তের সমালোচনা বা ভুল ব্যাখ্যা করাও গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই কে দোষী বা কে নির্দোষ, সেই বিতর্কে না গিয়ে বিরোধীদের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন, জনস্বার্থের কথা ভেবে দিল্লি পুলিশ যদি দমন পীড়নের আশ্রয় নিয়ে নিজামুদ্দিনের জমায়েত বন্ধ করে দিত তাহলে কি আপনারাই মোদী সরকারকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে গালাগাল দিতেন না? মোদী সরকার 'মুসলমান বিরোধী' বলে চিলচিৎকার করতেন না? আর এসব করে বিশ্বদরবারে ভারতের 'পরমতসহিষ্ণুতা' ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার অস্ত্র চিরশত্রু পাকিস্তান-সহ ভারত বিরোধীদের হাতে তুলে দিতেন না? না কি উদ্বাহু হয়ে মোদী সরকারের গুণকীর্তন করতেন? দিল্লির পুলিশ প্রশাসন সভা বন্ধ করতে শক্তি প্রয়োগ না করে যে পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তাকে তো আপনাদের প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু তা না করে উলটে আপনারা পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের নিন্দে-মন্দ ও সমালোচনা করছেন করোনার ধুয়ো তুলে। এই তো আপনাদের রাজনৈতিক চরিত্র! কিন্তু মানুষি আপনাদের ধাপ্পাবাজি, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ধরে ফেলেছে। আগামী নির্বাচনে এর যোগ্য জবাব আপনারা হাতে-নাতে পেয়ে যাবেন। সেটা কিন্তু সুখকর হবে না।

সর্বোপরি নিজামুদ্দিন জমায়েতের আয়োজক বা উদ্যোক্তারা সারা বিশ্বে এমনকী, ভারতেও করোনা সংক্রমণের ভয়াবহতার কথা জেনেশুনে আইন ও প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাজোয়ারি সভা চালিয়ে গিয়ে শুধু কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই নয়, দেশদ্রোহিতারও পরিচয় দিয়েছে। যেখানে নবি মহম্মদের দেশ সৌদি আরব করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সেদেশের প্রতিটি মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে, সেখানে নিজামুদ্দিনের তবলিগি বন্ধ হলো না কেন? কোন অদৃশ্য শক্তি রয়েছে এদের পিছনে? খবরে প্রকাশ, ভারতে করোনা আক্রান্তদের ৩০ শতাংশ আক্রান্ত হয়েছে নিজামুদ্দিন ফেরত তবলিগিদের দ্বারা। তবলিগিরা সব পালিয়েছে। তবে মূল পাণ্ডা মৌলানা সাদ পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করেছে। কিন্তু মানুষের দাবি, ওই একই মামলা রুজু করা হোক তবলিগির সঙ্গে যুক্ত সবার বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, অন্তত এক ডজন দেশ থেকে তবলিগিরা দিল্লিতে এসেছে। চীন থেকেও এসেছে ৯ জন। কিন্তু প্রশ্ন, করোনার আঁতুড়ঘর চীনের তবলিগিরা 'ভিসা' পেলেন কী করে? তবে কী সর্ষের মধ্যেই ভূত? উপরন্তু 'গোদের উপর বিষ ফোঁড়া'র মতো অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গারাও নাকি ছিল ওই তবলিগে। তারা এখন নিখোঁজ। আসলে 'ভারত আপদ' অবৈধ রোহিঙ্গারা 'দ্বিতীয় কাশ্মীর' পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে মমতা সরকারের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে জামাই আদরে। ওই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা নানা সমাজ বিরোধী ও দেশ বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। অথচ রাজ্যের মুসলমান তোষণকারী সরকার নির্বিকার। তাছাড়া অরাজকতার 'মক্কা' এ রাজ্যের অধিকাংশ মুসলমান করোনাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। তারা মানছে না সরকারের কোনো আইন ও বিধিনিষেধ। তারা যেন অন্য গ্রহের বাসিন্দা। এর অবশ্য কারণও আছে। কিছুদিন যাবত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি খবর। আর সেটি হচ্ছে, এক শ্রেণীর মৌলানা-মৌলবি প্রচার করছেন, যেসব

মুসলমান পাঁচবার নামাজ পড়বে ও কোরান পাঠ করবে, করোনা তাদের স্পর্শ করবে না। আর এই খবর প্রচার হতেই সরকারি আইন না মানার প্রবণতা বেড়েছে মুসলমানদের মধ্যে। তারা লকডাউন অমান্য করে দলবদ্ধ হয়ে মসজিদে নামাজ পড়ছে। পুলিশ অসহায়। জোড়হাতে একসঙ্গে মসজিদে নামাজ না পড়ার অনুরোধ জানালেও অধিকাংশ তাতে কর্ণপাত করছে না। আবার পুলিশ মসজিদে তালা ঝোলাতেও পারছে না। তাই বহু মসজিদে এখনও চুপিসারে দলবদ্ধ নামাজ চলছে। ফলে সংক্রমণও বাড়ছে। তাছাড়া অনেক মুসলমান করোনা আক্রমণ ঠেকাতে মুসলমান কোরানের একটি আয়াত দিনরাত পাঠ করছে— যে আয়াতটি নাকি করোনা ধ্বংসে সক্ষম। একথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতেই হবে, কোরানে করোনার কথা আছে। তাই প্রশ্ন, কোরানে যদি করোনা ধ্বংস বা জব্দ করার কোনো আয়াত থেকেই থাকে তাহলে তা মুসলমান বিশ্বের মুসলমানদের মনে পড়ল নাই-বা কেন? পড়লে তো বিশ্বের বিশেষত আরবের হাজার হাজার মুসলমানকে করোনার শিকার হতে হতো না। বেঘোরে মরতে হতো না ভারত-বাংলাদেশের শত শত হতভাগ্য মুসলমানকেও। কাজেই রটনাটি যে সত্য নয়— ভুয়ো, মিথ্যে ও অপপ্রচার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই পুলিশের উচিত অপপ্রচারকারীদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু পুলিশের সেই ক্ষমতা আছে কি এ রাজ্যে? যে রাজ্যের মুসলমানরা শাসকদলের দুধেলগাই, ভোটব্যাঙ্ক, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে কোন পুলিশ? তারা যে শাসকদলের দলদাস। তাই মুসলমানরা যতই আইন ও নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করুক, লকডাউনকে বুড়ো আঙুল দেখাক, এ রাজ্যে তাদের সাত খুন মাপ। তা না হলে লকডাউনের মধ্যেও এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদের একটি মসজিদে দলবদ্ধ ভাবে নামাজ পড়তে পারে তারা? এতবড়ো দুঃসাহস? তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, উলটে পুলিশকে দেখা গেছে হাতজোড় করে মসজিদে নামাজ না পড়ার অনুরোধ জানাতে। এ রাজ্য থেকেও প্রায় শ'খানেক তবলিগি গিয়েছিল নিজামুদ্দিনে। তারা ফিরেও এসেছে এ রাজ্যে। কিন্তু তাঁদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠাবার আগে পরিবারের সঙ্গে থাকার কারণে বহু পরিবার হয়েছে করোনা সংক্রমিত। রাজ্য সরকার অবশ্য সে সব খবর চেপে দিয়েছে। চেপে দিয়েছে আক্রান্ত ও মৃতের খবর।

পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে করোনার মারণ ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সেদেশে মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা। এর প্রধান কারণ সত্যি বলতে, হাজার হাজার বাংলাদেশি সাধারণ মানুষ বহু দেশে শ্রমিকের কাজ করে। বিশ্বব্যাপী করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় সেই পরিযায়ী শ্রমিকরা দলে দলে ফিরতে থাকে বাংলাদেশে। ওই শ্রমিকদের অনেকেই শরীরে বয়ে নিয়ে আসে করোনার বিষ। সেই বিষ ছড়িয়ে পড়ে নিজ নিজ পরিবার-সহ সারা দেশে। বাংলাদেশ সরকার দেশবাসীকে করোনার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে। নাগাড়ে চলে প্রচারও। কিন্তু সেই সতর্কতা ও প্রচারকে উপেক্ষা করে হাট বাজারে, মসজিদ-মহফিল বা জলসায় যাতায়াত অব্যাহত রাখে। তাই অবাধ মেলামেশার ফলে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকে হু হু করে।

ওদিকে আবার একদল স্বঘোষিত মোল্লা-মৌলবি করোনাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে প্রচার করতে থাকে করোনাকে মুসলমানদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, করোনা কাফেরদের বিনাশ করবে। এমনকী পাঁচবার নামাজ পড়া ও কোরান পাঠেরও ফতোয়া দে, আরও কত কী! আবার 'পানিপড়া' পানের নির্দেশ দিলে তাঁদের বাড়িতে টাকা দিয়ে 'পানিপড়া' নেওয়ার লাইন পড়ে যায়। কিন্তু কোনো ফতোয়া, দাওয়াইতেই ফল না মেলায় জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মোল্লা-মৌলবিদের মুণ্ডুপাত করতে থাকে। এমতাবস্থায়, করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এবং মৃত্যু মিছিল দীর্ঘতর হলে হাসিনা সরকারের টনক নড়ে। অগত্যা সরকার দেশ জুড়ে লকডাউন জারি করে। নিষিদ্ধ হয় যে কোনো জমায়েত, সমাবেশ, মাহ্‌ফিল, ধর্মীয় জলসা, উৎসব, মসজিদে নামাজ পাঠ, সমবেত ভাবে অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, উপাসনা, পুজোপাঠ ও হাটবাজার, দোকান, রেস্তোঁরা, শপিংমল, সিনেমা হল প্রভৃতি। চালু হয় নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে দাঁড়ানো, হাঁটাচলা। বাংলাদেশিরা অবশ্য নিষেধাজ্ঞা, আইন, লকডাউন মেনে চলায় তাদের সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা নগণ্য। তবে বাংলাদেশে করোনা নিরাময়ের উপযুক্ত ওষুধ বা প্রতিষেধক না থাকায় এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অপ্রতুলতার কারণে সংক্রমণ ও মৃত্যুকে বাগে আনা সম্ভব হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সরকার সংক্রমণ ও মৃত্যু মিছিল আটকাতে বাধ্য হয়েছে লকডাউনকেই বাঁচার হাতিয়ার করছে। তাই সারা দেশে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। নামানো হয়েছে সামরিক বাহিনী। লকডাউন ভঙ্গকারী ও করোনা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছে সরকার। ব্যাস, এতেই কাজ। অপপ্রচারকারীরা সব বেপাত্তা। কোরান থেকে করোনা গেছে পালিয়ে। মানুষ ঢুকে পড়েছে ঘরে। তাই একথা বলতে বাধা নেই, হাসিনা সরকার যা করে দেখাতে পেরেছে, মমতা সরকার তা পারেনি। কারণ ভোটব্যাঙ্ক মুসলমান তুষ্টিকরণ। অবশ্য একদিন এ তুষ্টিরই কুফল ভোগ করতে হবে মমতার দলকে। তবে ভারত একদিন করোনামুক্ত হবে। দেশবাসী আবার হাসবে। বিশ্ব আজ ভারতকে অনুসরণ করছে। করছে প্রশংসাও। কিন্তু নিজামুদ্দিনের তবলিগিরা যখন তুলেছে জেহাদের জিগির, তখন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কারবারিরা একেবারে নিশ্চুপ। ৭০ বছরের সেকুরলারবাদের এটাই নির্মম পরিহাস।

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে রামায়ণ পর্যালোচনা

প্রতিবাদে তারাশঙ্কর

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

রামায়ণ মহাকাব্যের রাম, রাবণ , সীতা এই তিন চরিত্রই আমাদের কাছে সর্বাধিক আলোচিত ও সমালোচিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে সীতা কিংবদন্তীমূলক পঞ্চসতীর এক উজ্জ্বল উদাহরণ। আর বহুগুণের অধিকারী হয়েও রাবণ আমাদের কাছে এক আতঙ্কের চরিত্র হিসেবেই পরিচিত। লঙ্কেশ্বর রাবণ যেন ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিখ্যাত খল নায়ক। বহু বিবাহিত পুরুষ হয়েও নারী হরণ ও ধর্ষণ যেন তাঁর নিত্য কর্ম হিসেবেই সর্বজনবিদিত। সেই জন্যই বোধ হয় সীতাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে রাবণের কথায় মধুকবির কথা—'কার ঘর আঁধারিলি এবে নিবাইয়া প্রেমদীপ/এই তোর নিত্য কর্ম

জানি'। রামায়ণের রাবণ ও সীতা সম্পর্কে এমন ধারণা মানুষের কল্পনা প্রসূত নয়; মহাকবি বাল্মীকির চরিত্র-চিত্রণের সূত্র ধরেই আমাদের এমন ধারণা সম্ভব হয়ে উঠেছে। সেই সূত্র থেকেই যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে রয়েছে—ধরিত্রী কন্যা সীতা—সর্বংসহা; সীতা অপহৃতা হয়েও সতী। মহাকবি বাল্মীকি ভারতীয় নারী ঐতিহ্যের আদর্শকে সীতা চরিত্রে মহিমান্বিত করেছেন। এমন প্রবাদপ্রতীম প্রামাণিক সত্যকে বিকৃত ব্যাখ্যায় কলঙ্কিত করতে চেয়েছিলেন কিছু বস্তুতান্ত্রিক পণ্ডিত। ভারতীয় সংস্কৃতির এক সাধক এবং পরবর্তীকালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত মহান কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে এসেছিল তেমন এক

কলঙ্কিত আলোচনা। তিনি তাঁর তীব্র প্রতিবাদে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই বিকৃত আলোচনাকে। 'আমাদের কথা' নামক আত্মজীবনীর পাতায় তারাশঙ্কর তাঁর জীবনের তেমন এক চরম অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে লিখেছেন—

মার্ক্সবাদীদের অনেকগুলি কাগজ তখন ছিল—তার মধ্যে প্রধান একখানি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল—যাঁর লেখক ছিলেন একজন ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক। প্রবন্ধটিতে রামায়ণ কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে মহাকবি বাল্মীকি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের তুলনামূলক সমালোচনা করেছিলেন। তাতে একস্থানে বলেছিলেন বাল্মীকি আশ্চর্যভাবে মধুসূদন অপেক্ষা অধিকতর মার্ক্সবাদী।

এহ বাহ্য, তিনি এতে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে অরণ্যকাণ্ডে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন লঙ্কার দিকে, তখন পথে বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধের পরই তিনি বনমধ্যে সীতাকে ধর্ষণ অর্থাৎ দেহগতভাবে তাকে ভোগ করেছিলেন। মূল বাল্মীকি—রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড ৫২ সর্গ থেকে কয়েকটি শ্লোকও তিনি উদ্ধৃত করে তাঁর এই চমকপ্রদ গবেষণাকে অকাট্য ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন।

তারাশঙ্কর রামায়ণের এক একনিষ্ঠ নিবিড় পাঠক ছিলেন। বালক বয়সেই তিনি তাঁর পিতার পুস্তকভাণ্ডার থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করেছিলেন অনেক পরে। তারাশঙ্করের মতে ভারতীয় সাহিত্যের এক মহান সৃষ্টি মহামুনি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্য অখণ্ড ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি থেকে ধর্ম-দর্শন-আধ্যাত্মিকতা সমস্ত কিছুরই এক অক্ষয় ভাণ্ডার এবং সর্বকালের সর্বমানবের এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের কোনোরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা ভারতীয় ঐতিহ্যের অপমান বলেই মনে করতেন তিনি। এই মানসিকতা থেকেই ইংরেজি সাহিত্যের ওই অধ্যাপকের এই প্রবন্ধ পাঠে শিউরে উঠেছিলেন এবং তাঁকে এই বিষয়ে এক দীর্ঘ চিঠিও লিখেছিলেন তারাশঙ্কর। অধ্যাপক প্রাবন্ধিক সহস্র বছর পরে অভিনব সত্যকে আবিষ্কার করার গৌরবে খুব সপ্রতিভ অহংকারে উত্তর দিয়েছিলেন তারাশঙ্করকে। বিষয়টি নিয়ে তারাশঙ্কর বিধানসভাতেও আলোকপাত করেন। ফলে ওই অধ্যাপক তাঁর সেই প্রবন্ধটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এই নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তারাশঙ্করের মতবিরোধও হয়। বিধানসভা সংক্রান্ত ঘটনাটির কথা জানতে পারি তারাশঙ্কর পৌত্র অমলাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে।

ওই প্রাবন্ধিকের অভিনব আবিষ্কারের অভিমতগুলি বাল্মীকি রামায়ণ পাঠেই ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলেন তারাশঙ্কর। তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

আমি মূল সংস্কৃত রামায়ণ দেখবার জন্য ব্যাগ্র হয়ে ঠিক সেই রামায়ণখানিই সংগ্রহ করেছিলাম যেখানি এই অধ্যাপক মহাশয় পড়েছিলেন এবং যা থেকে তিনি এই সত্য আবিষ্কার করেছিলেন।

এর আগে তারাশঙ্কর রামায়ণের কেবলমাত্র একজন তত্ত্বদর্শী পাঠক ছিলেন। রামায়ণে দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকি হয়ে ওঠার তত্ত্বটি তিনি তাঁর 'কবি' উপন্যাস ও 'যুগবিপ্লব' নাটকে নায়ক চরিত্রের উত্তরণে প্রয়োগ করেছেন। আর এই ঘটনার সময় থেকে তিনি হয়ে উঠলেন তথ্য-অনুসন্ধানী এক গবেষক। একেবারে তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টিতে বাল্মীকির কবিত্ব এবং সীতা সম্পর্কে মহাকবির অভিমত উদ্ঘাটনই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়ার জন্য নয়, বিকৃত ব্যাখ্যার হাত থেকে ভারতীয় আদর্শের ঐতিহ্যকে অম্লান রাখতেই তারাশঙ্কর রামায়ণ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। একজন গবেষকের ন্যায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মহামুনি বাল্মীকি বিরচিত সুবিশাল সংস্কৃত রামায়ণের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি একেবারে শব্দ ধরে ধরে সমগ্র একবার বা দু'বার নয় একেবারে তিন তিন বার পাঠ করেন তারাশঙ্কর। কেবলমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই তাঁর রামায়ণ পাঠের এই দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অবিস্মরণীয়।

প্রথমবার রামায়ণ অনুসন্ধানে তারাশঙ্কর দেখেন অরণ্যকাণ্ডের ৫১ সর্গে জটায়ুর মৃত্যুর পর ৫২ সর্গের শুরুতেই বাল্মীকি বলেছেন—'রাবণ সীতার দিকে তাকালেন এবার'। দেখলেন জটায়ুর মৃত্যুতে সীতা বিলাপ করছেন। রাবণ সীতাকে পুনরায় আয়ত্ত করার জন্য অগ্রসর হলেন। আর সীতা বনের মধ্যে গাছের আড়ালে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তখন রাবণ তাঁকে জোর করে গাছের আড়াল থেকে টেনে আনেন। সেই সময় বাল্মীকি একটি শ্লোকে বলেছেন—'প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং বভুব সচরাচরম্'। তারাশঙ্করের মন্তব্য—এই 'প্রধার্ষিতা বৈদেহী' শব্দ দুটিতেই ব্যাখ্যার যত জটিলতা। এই শব্দদুটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেই ব্যাখ্যাকার এই ব্যাখ্যা করেন যে—সীতাকে রাবণ বনমধ্যে দেহগতভাবে ভোগ করেছেন, এই কথাই বাল্মীকি লিখেছেন। তার সঙ্গে লিখেছেন—এখানেই মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে বাল্মীকি চরম প্রগতিশীল। মার্কসবাদীর তত্ত্ব এর মধ্যে পরিস্ফুট। প্রথমবার রামায়ণ পাঠে তারাশঙ্কর দেখেন উক্ত অধ্যাপক মহাশয় উদ্ধৃতি উদ্ধারে কোনো ভুল করেননি। তাই তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের কোনো সূত্র তিনি পাননি—অথচ মহামুনি বাল্মীকি সীতা সম্পর্কে এমন কথা লিখতে পারেন বলে বিশ্বাসও করতে পারলেন না। তাই, তিনি কেবলমাত্র অরণ্যকাণ্ডের উপর নির্ভর করে নিশ্চিত হতে পারলেন না। সমগ্র রামায়ণের নিরিখে ওই শ্লোক ও শ্লোকের শব্দগত তাৎপর্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট হলেন।

দ্বিতীয়বারে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক তারাশঙ্কর গভীর নিষ্ঠা সহ সযত্নে সমগ্র রামায়ণখানির প্রতি–শ্লোকের প্রতি-ছত্রের পাঠ গ্রহণ করলেন। পড়তে পড়তে তিনি দেখেন—'কর্মণা মনসা বাচা' ইত্যাদি শ্লোকে সীতার অগ্নিপরীক্ষার চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। তারপর লঙ্কাকাণ্ডের ১১৮ সর্গের একটি শ্লোকে তিনি পড়েন—'পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরা' ইত্যাদি। যেখানে সীতা বলেছেন পরাধীন দেহের উপর তাঁর কোনো হাত ছিল না। প্রথমবারের পাঠে তারাশঙ্কর

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছিলেন আর দ্বিতীয়বারের পাঠে পেলেন আঘাত। তথাপি তখনও পর্যন্ত তিনি উক্ত অধ্যাপক মহাশয়কৃত রামায়ণের সহজ ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারলেন না। আরও অগ্রসর হলেন তিনি। লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ডের ১২শ ও ১৩শ সর্গে দেখলেন, রাবণ সভা ডেকে পারিষদবর্গকে সীতা হরণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করছেন। বলেছেন, 'দণ্ডকারণ্য থেকে আমি তাকে হরণ করে এনেছি কিন্তু সে আজও আমার শয্যাভাগিনী হয়নি'। বলেছেন, ''এই নারীর জন্য আমি কামার্ততায় বহ্নিজ্বালার মতো দাহ অনুভব করছি সর্বদেহে সর্বক্ষণ। সে আমার কাছে এক বৎসর সময় প্রার্থনা করেছে। সে প্রতীক্ষা করছে রামের''। অন্য এক জায়গায় সীতাকে ভয় দেখিয়ে তিনি বলছেন—''বৎসরান্তে আমার অনুগামিনী না হলে তোমাকে কেটে তোমার মাংস আমি প্রাতঃরাশের সঙ্গে গ্রহণ করব''। ১৩শ সর্গে মহাপার্শ্ব নামক পরিষদ রাবণকে অনুযোগ করে বলেছেন, ''বলপূর্বক কুক্কুটেরা যেমন রমণ করে—সেইভাবে 'প্রবর্ত্তস্ব মহাবল'। সীতাকে বার বার আক্রমণ করে 'ভুঙ্ক্ষ্ব চ রমস্ব চ'।'' তাছাড়া, সীতাকে হরণ করে দেগতভাবে বলপূর্বক ভোগ না করা—নিজের মূর্খতা বলেই জানিয়েছেন রাবণ।

কৌতূহল জাগে, তাহলে কি ধীশক্তি তথা চারিত্রিক স্থিতিশীলতার গুনেই রাবণের পক্ষে এমন ধৈর্যধারণ সম্ভব হয়েছিল! একেবারে উদাহরণ উদ্ধার করে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, সীতার সামনে রাবণের এই স্থিতিশীলতা রাবণ চরিত্রের কোনো মহত্ত্ব নয়, এ এক চরম অভিশাপের ভয়। পূর্বে একদিন রাবণ পুঞ্জিকস্থলী নামে এক অপ্সরাকে আকাশলোকে জোরপূর্বক ভোগ করেন। এই ঘটনার জন্য ব্রহ্মা তাঁকে অভিশাপ দেন যে—রাবণ বলপূর্বক কোনো নারীকে ভোগ করলে তাঁর দশমুণ্ড একশত ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। সেই শাপের ভয়ে রাবণ সীতার উপর বলপ্রয়োগ করেননি। আর সীতার যে কথা, 'দেহ আমার পরাধীন ছিল'---তার অর্থ এই যে, বলপূর্বক অপহরণকালে রাবণ তাঁর হাত ধরেছিল, জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধকালে রথ চূর্ণ হলে রাবণ সীতাকে বাঁ কাঁধের উপর ফেলে ডান হাতে যুদ্ধ করেছিল। এখানে এই অঙ্গস্পর্শের কথা বলা হয়েছে। এখানেও ক্ষান্ত হননি তিনি, এরপর আরও কী আছে এবং 'প্রধর্ষিতায়াং' ও 'বৈদেহী' শব্দদুটিকে মহাকবি কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন তা জানার জন্য তারাশঙ্কর আবার নবউদ্যমে নব নিরিখে রামায়ণ পাঠে মনোনিবেশ করেন। তৃতীয়বার রামায়ণ পাঠ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন—

গোটা রামায়ণখানির প্রতি পঙ্‌ক্তি খুঁজে দেখছিলাম কোথায় ধর্ষিত, ধর্ষণ শব্দ আছে। এবং কী অর্থে ব্যবহার করেছেন মহাকবি। বলপূর্বক নারীদেহ ভোগের কথা কয়েকবারই আছে, সেখানে একস্থানেও বাল্মীকি 'ধর্ষণ' শব্দ ব্যবহার করেননি সেটি আমার চোখে পড়েছিল। রম্ ধাতু এবং ভুঙ্ ধাতুর ব্যবহার দেখেছি। 'কুক্কুটবৃত্তেন ভুঙ্ক্ষচ রমশ্চ'। রাবণ পুঞ্জিকস্থলী প্রসঙ্গে বলেছেন—'ময়াভুক্তা'। রাবণকে অভিশাপ প্রসঙ্গে ব্রহ্মা একবার বলেন, 'বলান্নারী গমিষ্যসি'। ধর্ষণ শব্দই নেই। আমার সন্দেহ হয়েছিল বাল্মীকি ধর্ষণ শব্দ এই অর্থে ব্যবহারই করেননি। তাই কোথায় কোন পঙ্‌ক্তিতে ধর্ষণ শব্দ আছে খুঁজে বের করে একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম। দেখেছিলাম, আমার অনুমানই সত্য। শতাধিকবার (বোধ হয় ১২৭ বার) ধর্ষণ শব্দের ব্যবহার আছে রামায়ণে। সর্বত্রই এক অর্থ—সে অর্থ জোরপূর্ব্বক বিপর্যস্ত বা লাঞ্ছিত করা। রাবণ স্বর্গজয় করেছে, হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করেছে, বানরকটক সুগ্রীবের মধুবন লণ্ডভণ্ড করেছে—সবই 'ধর্ষিত' হয়েছে; এবং এই অর্থেই ধর্ষণ শব্দ ব্যবহার হয়েছে রামায়ণে। দেহভোগ অর্থে রম্ এবং ভুঙ্ ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে।

আমরা জানি, সীতার অগ্নি পরীক্ষা এর আর এক অকাট্য যুক্তি। বর্তমান কালের মতো সেযুগে চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নত হলে প্রজানুরঞ্জনের জন্য স্বয়ং রামচন্দ্রও হয়তো-বা সীতার সতীত্ব পরীক্ষায় সে পথও অবলম্বন করতেন। কিন্তু স্মরণীয় যে ডাক্তারি পরীক্ষা অপেক্ষাও অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় এক ভয়ংকরতম পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল সীতাকে। সীতার অগ্নিপরীক্ষা রামচন্দ্রের চরিত্রকে কিছুটা কলুষিত করলেও—সীতা যে রাবণ কর্তৃক ধর্ষিত হননি সে কথা মহাকবি বাল্মীকি কেবলমাত্র রাবণের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। লঙ্কার অরণ্যের অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরে রাবণের মতো ভয়ংকর মানুষের কবলেও যে সীতা চরিত্র নিষ্কলুষতায় অম্লান আলোকে উজ্জ্বল ছিল—সে কথা অযোধ্যায় সর্বজন সমক্ষে প্রমাণ করতেই সীতার অগ্নি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। মহাকবির বর্ণনা থেকেই আমরা জানি— সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। সীতার নিষ্পাপ দেহের বিন্দুমাত্রও দগ্ধ করতে পারলেন না; বরং অগ্নিদেব তাঁকে কোলে করে নিয়ে উঠে আসেন এবং সেই জনসমক্ষেই চিরায়ত নারী আদর্শ সীতাকে রামের হাতে তুলে দেন। অগ্নিদেব রামচন্দ্রকে বলেন—

রাম! তোমার সীতাকে তুমি গ্রহণ কর। সীতা মনে-প্রাণে পাপহীনা বিশুদ্ধচিত্তের নারী। তাঁর অন্তরে ক্ষণিকের জন্যও রাম ভিন্ন রাবণের কথা অঙ্কুরিত হয়নি। সীতাকে বিন্দুমাত্র পাপস্পর্শ সম্ভব হয়নি। সীতা অনলেও নির্মল।

এ সম্পর্কে তারাশঙ্করের অভিমত—সীতা ভারত সংস্কৃতির যজ্ঞকুণ্ড থেকে যজ্ঞফলের মতো উত্থিতা এক নারী আদর্শ—নারী মহিমা। তিনি অম্লান দীপ্তিময়ী, যার মহিমার কাছে দেবীমহিমাও ম্লান হয়। সেই সীতার দেহ রাবণের দ্বারা কলুষিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বিগতজীবন হয়ে লুটিয়ে পড়তেন এবং রামের সম্মুখীন হয়ে কলুষিত দেহ ভস্মীভূত হওয়ার আবেদন জানাতেন। ওই অধ্যাপক সমালোচক বা প্রাবন্ধিকের গবেষণালব্ধ তথ্যকে প্রামাণিক তথ্য দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণ করে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, যে সীতা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে দু-দু'বার মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক অনুপম স্ফটিক প্রতিমার মতো কোটি কোটি মানুষের অন্তর্লোকে মণিবেদীর উপর অধিষ্ঠিতা রয়েছেন, মহাকবি বাল্মীকি যাঁকে কলুষহীন প্রদীপ্ত বহ্নির মতো নির্মাণ করেছেন তাঁকে অপব্যাখ্যায় কলুষিত করা সঙ্গত নয়।

দূরদর্শনের রামায়ণ-মহাভারত একটি উপলব্ধি

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

পুরাণ ও সাহিত্য ভিন্ন স্তরে কাজ করে। অধ্যাপক ক্লদ লেভি স্ট্রাউস লিখেছিলেন, অতি ভালো অনুবাদকের হস্তক্ষেপেও কবিতার রস ঠিক থাকে না। অন্য দিকে অত্যন্ত খারাপ করে বললেও পুরাণের আখ্যান কিছু না কিছু বার্তা বহন করে শ্রোতাদের মনে আবেশ সঞ্চার করে। এর কারণ বিচার করেছেন লেভি স্ট্রাউস, কবিতা মানব সভ্যতার যে স্তরে নির্মিত হয়, পুরাণ সেই স্তরের সৃষ্টি নয়। ভারতে পুরাণ মহাকাব্য একাকার। দুটিই ধর্ম পালনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। পৃথিবীর অন্যত্র এমন নেই। ফলে আমাদের দেশে পুরাণপ্রবাহ জীবন্ত।

কথাগুলি মনে এল বর্তমান করোনা-কালে গৃহবন্দি পরিস্থিতিতে দূরদর্শনে প্রচারিত রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাপক জন সমর্থন। অনেক তথ্যাভিজ্ঞ মহল জানাচ্ছেন—এটা একটা বিশ্বরেকর্ড। ভারতের আত্মা এই তথ্যের মাধ্যমে স্পষ্ট জলছাপ নিয়ে এসেছে। কেন রামায়ণ ও মহাভারত এতো জনপ্রিয় হলো? সাধারণভাবে কিছু কারণ পাওয়া সম্ভব।

ওখন পর্যন্ত অতিমারী করোনার কোনো নিরাময় পাওয়া যায়নি। আমরা সমগ্র বিশ্ব এর সঙ্গে যুদ্ধে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। বিজ্ঞানের কাছে আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। বিজ্ঞান এতদিন এইরকম জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব উৎসাহ দেখায়নি। এ অবশ্য অভিযোগ নয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান রাজনীতি ও অর্থনীতির অধীন। বিজ্ঞান-গবেষণা অদৃশ্য মারণ জীবাণু তৈরি করতে পারে—কিন্তু সেই মারণাস্ত্র সংবরণের উপায় তার আজও অনায়ত্ত। ফলে বিশ্বব্যাপী ভয় ছড়িয়ে পড়ছে। বিজ্ঞান যেখানে নিশ্চুপ বা অপেক্ষাতুর—তখন মানুষ আত্মরক্ষার অনভ্যস্ত উপায় অবলম্বন করছে। পৃথিবীর অন্য দেশের মতো নয়, আমাদের দেশের মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো অবস্থাতেই নেই। দরিদ্র তারা, খেটে খাওয়া মানুষ। অতিরিক্ত ঘর বিছানা কি তাদের আছে? এ অবস্থায় আধ্যাত্মিক নিরাময় ছাড়া উপায় নেই। তাই কি এই ব্যাপক গণ মানুষের সমর্থনে রামায়ণ ও মহাভারত পুনঃ প্রকাশের এমন অদ্ভুত বিশ্বরেকর্ড সম্ভব হলো?

এভাবে ভাবলে বলতে হবে সরকার দেশবাসীকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করতে চাইছে। এই কথাই বলেছেন বিরোধী দলের আইনজীবীরা। এসব কেঠো, মেঠো যুক্তি ছেড়ে অন্য কিছু কথার দিকে দৃষ্টি ফেলতে হবে। এস ওয়াজেদ আলীর গল্পটি আমরা সবাই এক সময় পড়েছি। লেখক এক গ্রামবাসী মুদিকে দেখেছিলেন, তার নাতিকে রামায়ণের

ভারতবর্ষ যতদিন রামায়ণ-মহাভারত ততদিন আমাদের মনোজগতে স্রোতোদ্বতী হয়ে ছিল, আছে—থাকবে। দূরদর্শনে প্রচারিত রামায়ণ ও মহাভারত সেই চিরসত্যকেই আরেকবার প্রমাণ করল।

গল্প পড়ে শোনাচ্ছেন। বহুদিন পর সেই গ্রামে তিনি একই দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন! একই ভঙ্গিতে মুদি তাঁর নাতিকে রামায়ণ শোনাচ্ছেন। একই ছবি কীভাবে ফিরে এল? খবর নিয়ে জানলেন, ইনি সেই মুদির উত্তরপুরুষ। উক্ত ভদ্রলোক আগে দেখা মানুষটির বংশধর। আগের মানুষটি এখন বেঁচে নেই! মন্তব্য করেছিলেন এস ওয়াজেদ আলী 'সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে—কোথাও কিছু পরিবর্তন ঘটেনি'। গল্পের নাম 'ভারতবর্ষ'। সেটা জানা না থাকলে এই আখ্যানের তাৎপর্য বোঝা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক প্রবন্ধে লিখেছেন, ভারতবর্ষে যা আছে তা থেকে যায়। এই আকর্ষণমূলক সংস্কার ও জীবনবোধ এদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একে কেউ কেউ ভারতের প্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বলে সমালোচনা করেন। তারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলেন, তাদের কাছে ধর্ম 'আফিম' (কেননা সেটা তাদের বিদেশি গুরুঠাকুররা বলে গেছেন!), আর সেজন্যই রামায়ণ-মহাভারত বর্জনীয়। এদের জনবিচ্ছিন্নতা সীমাহীন। তা না হলে এই গৃহবন্দি অবস্থাতেও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে তারা সর্বোচ্চ বিচারালয়ে উপস্থিত হতেন না।

রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দুই সর্বজনমান্য অবতারের জীবন ও কর্মানুষ্ঠানের বিবরণ। এ কাহিনি ভারতের সাধারণ মানুষ কোনো না কোনো ভাবে জনেন। এ কাহিনি পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে আমরা শুনি, মনে রাখি। পরের প্রজন্মকে শেখাই। ঘরবন্দি পরিস্থিতিতে দূরদর্শন সেই কাহিনিই আবার শোনাচ্ছে— ভারতবাসী দেখছে।

নাট্যকার বেরটোল্ড ব্রেশ্‌ট একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন— 'Epic Eliment'. তাঁর তত্ত্বটি নাট্যশাস্ত্রে অভিমত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে নির্বাসিত এই নাট্যকার মনে করতেন, নাটক তো মানুষের কৌতূহল মোচন করে। কোন কৌতূহল? মানুষ তো জানে জীবনে তেমন কোনো কৌতূহল অবশিষ্ট নেই। অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র—অসহায়। তারা কি জানেন না দারিদ্র্য অসহায়তার ছাড়া কিছুই নেই—এটা জানা কথা। তবে নাট্যকার কী করবে? ব্রেশটের মতে মানুষের কাছে নাটক যা 'হয়েছে তাকে বলে না—যা হয়েছে তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে চায়'। এটাই, তাঁর মতে মহাকাব্যিক উপাদান। তাঁর তত্ত্ব কাঠামোতে একেই বলে 'Eipic Theatre'।

মহাভারতের কথাই ধরুন। যুদ্ধকালের বর্ণনায় বার বার সঞ্জয় বলছেন, ধৃতরাষ্ট্র শুনছেন। কর্ণ নিহত হলেন! সঞ্জয়ের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র জানতে চাইলেন—সে কী? কীভাবে বীরশ্রেষ্ঠ সূর্যপুত্র কর্ণের মৃত্যু হলো? সঞ্জয় বলে গেলেন। সাধারণ নাটক—সাহিত্য। তা ক্রমে ক্রমে পরিণতির দিকে যাত্রা করে। মহাকাব্য পাঠক দর্শক জানেন—এরপর কী হবে। জানেন 'যথাধর্ম তথা জয়'। কিন্তু সেই জানা কথাগুলিই ফিরে ফিরে শুনতে বুঝতে চান তারা। ভারতবাসীর এই প্রবণতা চিরন্তন। পাশ্চাত্য শিক্ষার বহিরাবরণ খসে পড়েছে, বিজ্ঞান তার সক্ষমতার সর্বাতিশয়ী অহংকারে সাময়িক অভিঘাতের মুখে পড়েছে। বিশ্বের শাসন ও অর্থনীতিতে মহাশক্তিরা আজ হাঁটু মুড়ে পড়েছে—মৃত্যুর মিছিল চোখে দেখা যায় না। দূরদর্শন না দেখালেও ঘরবন্দি মানুষ এই চিরকালের জীবননাট্যে স্পষ্ট ও পরিত্রাণের মহাকাব্যই হয়তো কোনো না কোনোভাবে বলতেন। দূরদর্শন ঘরে ঘরে সেই মনোভাবটিকেই সঞ্চারিত করেছে। এখানেই ভারতবর্ষ বেঁচে আছে—থাকবে।

মহাভারতের শেষে 'স্বর্গারোহণ পর্ব', 'মহাভারতের মাহাত্ম্য' (আগেও আছে) উচ্চারিত হয়েছে সেখানে। বলা হয়েছে, যিনি পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ পাঠ করে শোনান তিনি পাপমুক্ত হয়ে ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি শ্রাদ্ধকালে এর কিছু অংশও ব্রাহ্মণদের শোনান, তাঁর পিতৃগণ অন্ন ও পানীয় লাভ করেন। শুধু কি তাই, 'সূর্যোদয়ে যেমন তমোরাশি বিনষ্ট হয়, মহাভারত শুনলে সেইরূপ কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত পাপ দূর হয় (রাজশেখর বসু ঃ 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত' সারানুবাদ', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ; কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, ৬৮৪ পৃ)। এই পুণ্য লাভ, পাপ দূরীকরণ শুধু একজনের নয়, মহাভারত কথা ব্রাহ্মণদের শোনালে (বিষয়টি আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। কারণ ব্রাহ্মণরাইতো জ্ঞান বিদ্যার আদি!) পূর্ব পুরুষ অন্ন জল পাবেন! যেকোনো সংকট কালে এই বোধই আমাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। স্বতন্ত্র স্বধর্মনিষ্ঠ আর জয়ী।

রামায়ণ-কে বলা হয়েছে কাব্য। মহাভারত হলো ইতিহাস। রামায়ণ বটবৃক্ষের মতো। মহাভারত পর্বে পর্বে বিন্যস্ত জটিল অরণ্য। মহাকাব্যই ভারতের প্রাণ-তপস্যার নির্যাস। মহাকাব্য বৃত্তান্তমূলক নয়। এখানে অনিঃশেষের আদল আছে। উত্তরকাণ্ডের ৯৩-৯৪ সর্গে আছে অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে উদ্‌যাপনের সময় লব-কুশ এসে শ্রীরামচন্দ্রকে রামায়ণ-গান শুনিয়েছেন। উপস্থিত মুনি-ঋষি-রাজারা অবাক। তাঁদের মনে হলো ঃ

উচুঃ পরস্পরং চেদং সর্ব এব সমাহিতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ
বিম্বাদ্‌বিম্বমিবোদ্ধৃতৌ।। (উত্তরকাণ্ড, ৯৪ সর্গ, ১৩শ শ্লোক)

এরা উভয়েই রামের সদৃশ, যেন বিম্ব থেকে উদ্ভূত দুটি প্রতিবিম্ব। এরা ২৪ হাজার শ্লোক আর একশত উপাখ্যান যুক্ত আদি থেকে ছয় কাণ্ডে বিস্তৃত ৫০০-র মতো সর্গযুক্ত রামায়ণ কথা শোনালেন। জানা গেল উত্তরকাণ্ডও আছে। (রাজশেখর বসু ঃ বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ; কলকাতা; মুদ্রণ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ; ৩৯৯ পৃ.)। এই বিন্দুটি নিশ্চয় সূচনা নয়। রাম না জন্মাতে রামায়ণ লিখলেন বাল্মীকি। কাহিনির শেষের সামান্য অংশ রামায়ণের মধ্যেই রামায়ণ শোনালেন কুশ আর লব। জানা কাহিনির এই আবর্তনই মহাকাব্যের আসল রহস্য। রামায়ণ ও মহাভারতের এই আবর্তন যুগে যুগে ভারতীয় মহাজাতি নির্মাণ করেছে।

বলা হয়েছে 'পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধকালে এই আয়ুষ্কর সৌভাগ্যজনক পাপনাশক বেদসম রামায়ণ শোনাবেন। এই গ্রন্থ পাঠ করলে পুত্রহীন পুত্র পায়, ধনহীন ধন পায়।' (উক্ত; ৪১১ পৃ.)। আচার্য রমেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, যা পড়তে হয় না তাই মহাকাব্য। কথাটি মজাদার। আসলে ভারতবর্ষ যতদিন রামায়ণ-মহাভারত ততদিন আমাদের মনোজগতে স্রোতোদ্বতী হয়ে ছিল, আছে—থাকবে। দূরদর্শনে প্রচারিত রামায়ণ ও মহাভারত সেই চিরসত্যকেই আরেক বার প্রমাণ করল— এই যা। ■

লকডাউনে ঘরবন্দি জেনারেশন জেডের নতুন আবিষ্কার

সন্দীপ চক্রবর্তী

টিভিতে রামায়ণ প্রথম সম্প্রচারিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। দিল্লিবাসী আস্থা ঢলের তখন জন্ম হয়নি। এখন তার ষোলো বছর বয়েস। সারা দেশে লকডাউন ঘোষিত হবার দিন অর্থাৎ ২৩ মার্চ, আস্থা বেশ মুশকিলেই পড়ে গিয়েছিল। কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে সিবিএস ই-র টেন্থ স্ট্যান্ডার্ডের পরীক্ষা। হাতে তখন অফুরন্ত অবসর। আস্থা আগে থাকতেই ছুটির প্ল্যানিং করে রেখেছিল। কিন্তু সব শেষ করে দিল লকডাউনের ঘোষণা। বাইরে বেরোনোর উপায় নেই। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া বন্ধ। এইরকম একটা বিচ্ছিরি পরিস্থিতিতে আরেকটি ঘোষণা করা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। লকডাউনে ঘরবন্দি মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত আবার টিভিতে সম্প্রচার করা হবে। প্রথম দিন বাবা-মা'র সাধাসাধিতেই টিভির সামনে বসেছিল আস্থা। পরের দিন থেকে আর ওকে সাধতে হয়নি। ইদানীং ও সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে রামায়ণ দেখবে বলে। ওর নিজের কথায়, ''সিরিয়াল দুটো খুব ন্যাচারাল। অযথা নাটক তৈরি করার চেষ্টা নেই। বেশি বিজ্ঞাপন নেই। সব থেকে বড়ো কথা, গল্পটা খুব ভালো। একটা এপিসোড দেখলে মনে হয় পরেরটাও দেখি।'' তিন দশক বেশ লম্বা সময়। এতদিন পর পুরনো কোনও জনপ্রিয় সিরিয়াল নতুন করে দেখানো হলে সাধারণত বিশেষ কক্ষে পায় না। প্রজন্মভেদে মানুষের রুচি ও পছন্দ-অপছন্দ বদলে যায়। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত সাধারণের পর্যায়ভুক্ত নয়। এই দুটি কাহিনির আবেদন যে চিরকালীন তার প্রমাণ আরও একবার পাওয়া গেল আস্থার স্বীকারোক্তিতে। এখানে অবশ্যই আরও একজনের কথা বলতে হবে। তিনি দীপিকা সিংহ। পাটনার একটি কলেজে পড়ান। বয়েস সাতাশ বছর। দীপিকাও আস্থার মতো নিয়মিত রামায়ণ মহাভারত দেখেন। হ্যা তিনি তার বয়স, সময় এবং প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে প্রশ্ন তুলেছেন। নির্বিবাদে রামায়ণের সব ঘটনা মেনে নিতে পারেননি। তার প্রশ্ন, সীতাকে কেন অগ্নিপরীক্ষা দিতে হলো? কেনই বা তিনি নির্বাসিত হলেন? প্রশ্ন তিনি করতেই পারেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে, সীতার সঙ্গে কোথাও না কোথাও একাত্মতা অনুভব করছেন বলেই রামায়ণ তথা ভারতবর্ষের মহানায়িকার দুঃখ তাকে পীড়া দিচ্ছে। এবং তিনি প্রশ্ন তুলছেন।

রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা এবং চরিত্রগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের এই একাত্মতাবোধ কোনও নতুন কথা নয়। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-অর্জুন-দ্রৌপদীকে তাদের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছে। রামায়ণ মহাভারত তাদের কাছে নিছক মহাকাব্য নয়, ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই দেশ যতই 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' নামের প্রসাধনে ঢাকা পড়ুক, এখানকার কোটি কোটি মানুষ আজও বিশ্বাস করে তাদের একজন মর্যাদাপুরুষোত্তম সম্রাট ছিলেন, যাঁর নাম শ্রীরাম। যিনি সারা ভারতবর্ষকে প্রথম এক এবং অভিন্ন জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত করেছিলেন। যিনি মেলাতে পেরেছিলেন এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষকে। এবং সারা ভারতবর্ষ 'শ্রীরাম' নামক ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এখানকার মানুষ বিশ্বাস করে তাদের একজন মা ছিলেন, যাঁর নাম সীতা। যিনি সারা জীবন অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেও মুহূর্তের জন্য মাতৃধর্ম, নারীধর্ম এবং স্ত্রীধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। দীপিকা রামের সমালোচনা করেছেন কিন্তু যার কথা মাথায় রেখে করেছেন, সেই সীতা কোনওদিন রামের সমালোচনা করেননি। কারণ তিনি জানতেন রামে রাজধর্ম পালন করেছেন। একজন সম্রাটের কাছে তার ব্যক্তিধর্মের চেয়ে রাজধর্ম সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। অন্তত তাই হওয়া উচিত। সীতা এটাও জানতেন যে, রাজধর্ম পালনার্থে রাম তাকে নির্বাসিত করেছেন ঠিকই কিন্তু তার জন্য নিজেও দিবারাত্রি মনোকষ্টে ভুগেছেন। পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে শান্তি পাননি মুহূর্তের জন্য। রাজচক্রবর্তী সম্রাট হিসেবে রাম চাইলে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করতে পারতেন, করেননি। সারা জীবন একনিষ্ঠ থেকেছেন সীতার প্রতি। সীতাও রাম ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের কথা ভাবেননি।

ভারতবর্ষে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হয় বা কেমন হওয়া উচিত তার পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ মেলে রামায়ণে।

ফেমিনিজমের আতসকাচের নীচে সীতা-দ্রৌপদীদের খাটো মনে হতে পারে কিন্তু মানবিক এবং পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে তাঁরা তা নন। নর-নারীর সম্পর্ক তখনই পূর্ণতায় পৌঁছয় যখন অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। ওটি না থাকলে সম্পর্ক টেকে না। আজকের ইউরোপ-আমেরিকায় বিবাহবিচ্ছেদের পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

তবুও আস্থা ঢল এবং দীপিকা সিংহ ধন্যবার্দাহ। ওরা এবং ওদের মতো অসংখ্য ছেলে-মেয়ে রামায়ণ-মহাভারত দেখছেন এবং দেখে চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন—এটা করোনা মহামারীর আবহে মস্ত বড়ো খবর। এর থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট, ভারতের জেনারেশন জেড তাদের শেকড় হারায়নি। বস্তুত, সম্প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথম সপ্তাহেই রামায়ণের দর্শকসংখ্যা যে ১৭ কোটিতে পৌঁছতে পেরেছে এবং চতুর্থ সপ্তাহের শেষে সংখ্যাটি দাড়িয়েছে ৫১ কোটিতে তার একটি প্রধান কারণ জেনারেশন জোডের টিভির সামনে বসে পড়া। মনে রাখতে হবে, এই সময় বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলেও তাদের পুরনো জনপ্রিয় সিরিয়ালগুলি সম্প্রচার করছে। এইসব সিরিয়ালের মধ্যে সিআইডি এবং বিগ বসের মতো সিরিয়ালও রয়েছে। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে গেছে রামায়ণ ও মহাভারত। এখনও পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক টিআরপির সিরিয়াল বলে স্বীকৃত গেম অব থ্রোনসের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে রামায়ণ। এমনকী, ভেঙে গেছে আইপিএল ফাইনালের রেকর্ডও। তিন দশক পর টিভির পর্দায় ফিরে এসে রামায়ণ-মহাভারতের এই চমকপ্রদ সাফল্য সব দিক থেকে আশাব্যঞ্জক। বিশেষ করে মেট্রো কালচারে অভ্যস্ত দিল্লি-মুম্বাই-কলকাতার অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েরা যেভাবে তাদের বাবা-মা'র সঙ্গে বসে বসে টিভিতে রামায়ণ ও মহাভারত দেখছে, তা অন্যরকম ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। এই প্রসঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক মহলের কথা না বললে চলে না। এ দেশে রামকে নিয়ে, রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে রাজনীতি সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই হয়ে আসছে। ব্রিটিশরা বরাবর রাম এবং কৃষ্ণকে মহাকাব্যের 'হিরো' হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। তাদের কাছে রাম এবং কৃষ্ণ কাল্পনিক চরিত্র। এদের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তথাকথিত ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও এই মত বজায় রেখেছেন। কেউ কেউ আরও এককাঠি এগিয়ে রাম এবং কৃষ্ণকে 'হিন্দুদের দেবতা' বানিয়ে ভারতের ইতিহাসকে ঘুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতকে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' হিসেবে উল্লেখ করলেও এরা সে কথায় কর্ণপাত করেননি। ভারতের ইতিহাস বিকৃত করার এই ষড়যন্ত্রের পিছনে ছিল কমিউনিস্টরা। তাদের মদত জুগিয়েছিল কংগ্রেস। উদ্দেশ্য ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ধ্বংস করে এ দেশের সাংস্কৃতিক ভিতটি দুর্বল করা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি, কংগ্রেস এবং এ দেশের কমিউনিস্ট দলগুলি এখনও এই নেতিবাচক প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তার প্রমাণ রামায়ণ ও মহাভারতের পুনঃসম্প্রচারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর প্রতিবাদ। তার মতে রাজনৈতিক ফয়দা লোটার জন্য মোদী সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। না, রাহুল গান্ধীর এহেন আচরণে বিস্ময়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। রামায়ণ এবং রামের কথায় রাহুল গান্ধীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ভাবতে থাকেন রাম নামক সোনার কাঠির ছোয়ায় এই বুঝি 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতবর্ষের ঘুম ভেঙে গেল! ঘুম একবার ভাঙলে জাতপাত আর ভেদাভেদের রাজনীতি চলবে না। বাঙ্গালিরা শিখ পাঞ্জাবিদের দেখে 'বাধাকপি' বলে উপহাস করবে না। দক্ষিণ ভারতীয়রা উত্তর ভারতীয়দের বিষনজরে দেখবে না। সুস্থ রাজনৈতিক আবহাওয়ায় স্বাস্থ্য ফিরবে দেশের। এমন একটি ইতিবাচক ভাবনা রাহুল গান্ধীরা কীভাবে ভাবতে পারেন। তাই তার প্রতিবাদ।

তবে আমাদের ভাগ্য ভালো এ দেশের মানুষ রাহুল গান্ধীর কথা তত সিরিয়াসলি ধরেন না। তাই বোধহয় রামায়ণ ও মহাভারত সব রেকর্ড ভেঙে এগিয়ে চলেছে। সব থেকে বড়ো কথা দেশের অগণিত অল্পবয়সি ছেলে-মেয়ে রামায়ণ দেখছে। রিঅ্যাক্ট করছে। ঘুম ভাঙছে দেশের। অহর্নিশ মৃত্যুভয়ে শিহরিত এই সময়ে এর থেকে বড়ো পাওয়া আর কী হতে পারে। □

ভারতবর্ষ

এস. ওয়াজেদ আলী

পঁচিশ বছর পূর্বে আমি কলকাতায় এসেছিলাম তখন আমার বয়স দশ-এগারো হবে। আমাদের বাড়ির কাছে একটা মুদিখানা ছিল। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলাকার একটি বই নিয়ে সাপ খেলানো সুরে কী পড়ত। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চারিপাশে তাঁর ধব্‌ধবে সাদা চুল, নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা, গম্ভীর গুল্ফ ছেয়ে শূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মতো চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক-একবার বৃদ্ধের কাছে এসে পাঠ শুনত, আবার খদ্দের এলে, গিয়ে তাদের দেখাশুনা করত। আমারই বয়সি একটা ছেলে খালি গায়ে বুড়োর কাছে সর্বদা বসে থাকত। আর তার পাশে থাকত দুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হতো বিষয়টি তারা বিশেষ ভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কী পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কী করে, ক'টি সেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব ক্রিয়াকণ্ডের কথা শুনে ছেলে-মেয়েদের মুখ আনন্দ, আগ্রহ আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম তখন কেউ আমায় ডেকে নিয়ে যেত। সেতু বাঁধা হচ্ছিল, আমি তখন জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কিনা, আর পার হয়েই-বা কী করেছিলেন তা তখন জানতে পারিনি।

দু'চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে গেলুম। তারপর কোথা থেকে যে কোথায় গেলুম ঠিকানা নেই। পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে গেল, সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তানসন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের কোন গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল। তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম। এমন কত শত জিনিস আমরা ভুলে যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ঘরবাড়ি সব বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড়ো বড়ো ম্যানশন মাথা তুপলে দাঁড়িয়েছে। আগে দু'চারটে রিকশা আর ঘোড়ার গাড়িই সে পথ দিয়ে যেত, এখন বড়ো বড়ো মোটর অনবরত যাওয়া আসা করছে। আগে মিট মিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলত। এখন ইলেকট্রিকের আলো স্থাটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভবাছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। জিনিসপত্র আগের মতো সাজানো রয়েছে। চাল থেকে এখনো কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধ হয় সেই পঁচিশ বছরের আগের সেই বাতিটি।

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে। পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মতো একটি বৃদ্ধ গদির উপর বসে মোটা একটা বই নিয়ে সাপ খেলানো সুরে কী পড়ছিল। পঁচিশ বছর আগের সেই মধ্য বয়স্ক লোকটির মতো একটি মধ্য বয়স্ক লোক এক-একবার এসে সেই পাঠ শুনছিল আর আবশ্যক মতো খদ্দেরদের দেখাশুনা করছিল। সেই আগের ছেলেটি মতো একটি ছেলে খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসে ছিল। তার পাশে বসে ছিল সেই আগের মেয়েদের মতো দেখতে দুটি মেয়ে।

আমি আর থাকতে পারলুম না, সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, "মশাই মাপ করেন, পঁচিশ বছর পূর্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বড়েনি, আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেতুবন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন?"

বৃদ্ধ তার চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলেন। তাঁর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিয়ে তারপর বিস্ময়ের সুরে বললেন, " পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?" আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ। বৃদ্ধ বললে, " তাহলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতামশায়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলে-মেয়েরা তাঁর কাছে বসে পাঠ শুনত। ছেলেটি এখন ওই বড়ো হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতোই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করছে। কন্যাদুটি আমার নাতনি, ওই ছেলের সন্তান।"

বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, " এ বইটি কবেকার।" স্মিত হাস্যে বৃদ্ধ বললে, এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার ঠাকুরদা বটতলায় এটি কিনেছিলেন। সে অনেকদিনের কথা, আমার তখন জন্ম হয়নি।"

বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলুম। আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি, প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল—সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে, তার পরিবর্তন হয়নি।

(লেখকের 'দাশুকের দরবার' গ্রন্থ থেকে রচনাটি গৃহীত)

তেলেনিপাড়ায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ

ইন্টারনেট বন্ধ করে সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা

দীপ্তাস্য যশ

আমার ছোটবেলার শহর চন্দননগর। আমাদের ছোটবেলায় সকালে আমাদের ঘুম ভাঙত একের পর এক জুটমিলের সাইরেন শুনে। বড়োরা মিলের শিফট শেষের সাইরেনের আওয়াজ শুনে ঘড়ি মেলাতেন। সকালে আর

আক্রমণের প্রতিবাদে পথে বসে ধর্না সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও অর্জুন সিংয়ের।

সন্ধ্যেয় দেখতাম দলে দলে লোক জিটিরোড ধরে সাইকেল নিয়ে চলেছে বিভিন্ন মিলে কাজ করতে।

গঙ্গার ধারের চন্দননগর আর ভদ্রেশ্বরের সংলগ্ন এই তেলিনীপাড়া শুধুমাত্র চন্দননগরেরই নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। ইন্ডিয়া জুটমিল, বঙ্গশ্রী জুটমিল, ভিক্টোরিয়া জুটমিল --এই তিনটি মিলে কর্মসংস্থান হতো কয়েক লক্ষ মানুষের। তবে আজ সেসব নেহাতই অতীত দিনের কথা। একের পর এক ইউনিয়নের ঝামেলা আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবসা বিমুখ নীতি আজ তেলিনীপাড়ার সেই সুদিন আর নেই। তবে এই মিলগুলিতে কাজ করতে আসা বাঙ্গালি, তেলুগু, ওড়িয়া, বিহারি শ্রমিকদের জীবন আজও এই জুটমিল এবং সেই সংলগ্ন এলাকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। মূলত শ্রমিক কলোনিগুলিতেই এদের বসবাস। সেখানে এই মহামারীর সময়ে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং সত্যিই খুব কঠিন কাজ। কিন্তু তারপরেও তারা লড়ছিলেন নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে এই ভয়াবহ চীনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করতে। নিজেদের রুজি রুটি ক্ষতিগ্রস্ত করেও তারা লড়ছিলেন। কিন্তু সেই লড়াইই আজ তাদের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কয়েকদিন ধরেই চন্দননগরের উর্দিবাজারে একের পর এক করোনা আক্রান্তের হদিশ পাওয়া গেছে। সেই ঘটনার রেশ আছড়ে পড়েছে সিঙ্গুরের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারেও। তেলিনীপাড়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও কিছু মানুষ করোনা আক্রান্ত বলে খবর হয়। যেহেতু রাজ্য সরকার কোথায় কত আক্রান্ত এবং তাদের এলাকার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করছে না, ফলে তেলিনীপাড়ার মানুষকে এই খবরের উপরেই নির্ভর করে চলতে হয়। এমতাবস্থায় নিজেদের রক্ষার্থে তারা সিদ্ধান্ত নেন আপাতত তারা নিজেদের এলাকা বন্ধ রাখবেন এবং সেখানে অন্য এলাকার কাউকে আগামী ১৫ দিন প্রবেশ করতে দেবেন না। কারণ তাঁরা জানেন এই ঘনবসতি এলাকায় একবার যদি চীনা ভাইরাস ছড়িয়ে পরে তাহলে তা অতিদ্রুত সমগ্র এলাকার অধিকাংশ মানুষকে আক্রান্ত করে ফেলবে। এই ঘন বসতি এলাকাকে তাই আশপাশের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াই তাদের কাছে একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তাঁরা নিজেরাই নিজেদের কন্টেইনমেন্ট করার সিদ্ধান্ত নেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে জানা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থা চালু করার পরে তাঁরা এলাকায় বাইরের সবজিওয়ালা, ফলওয়ালা সবারই প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। এমনকী এলাকায় রমজান উপলক্ষ্যে যে বাজার বসে সেই বাজার সম্বন্ধেও তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে তাদের এলাকার মধ্যে এই বাজার তাঁরা এবছর চালু করবেন না। কারণ বাজার থেকে ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কা খুবই বেশি। তামিলনাড়ুর সবজি মন্ডির উদাহরণ আমরা সবাই জানি।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, এক মুসলমান সবজিওয়ালা যখন তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে চায় তখন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী কিছু যুবক তাকে বলে আপাতত পনেরো দিন এই এলাকায় বহিরাগত কারুর প্রবেশ নিষেধ। এরপর সবজিওয়ালার সাথে যুবকদের কিছু বাকবিতণ্ডা

হুগলীর তেলেনিপাড়ায় হিন্দুদের ওপর মুসলমান দুষ্কৃতীদের আক্রমণ

তেলেনিপাড়ায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শাসকদল ও রাজ্য সরকার একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে এলাকার হিন্দুদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। আমি হুগলীর সাংসদ। অথচ আমাকে ওই এলাকায় যেতে দিচ্ছে না প্রশাসন। এমনকী জেলা শাসকের সঙ্গেও দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমি এ র তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিজেপি সাংসদ

জেহাদি তাণ্ডবে জ্বলছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর

তরুণ পণ্ডিত

ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে সারা দেশের মানুষ যখন আতঙ্কিত তখন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এই মারণ রোগকে যেমন অবজ্ঞা করছে, তেমনি তারা ভিন রাজ্য থেকে ফিরে এসে লকডাউনকে উপেক্ষা করে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলার মানুষের অনুমান, দিল্লির নিজামুদ্দিন ফেরত বেশ কিছু তবলিগি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তার ফলে জেলার মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

গত ১১ মে জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রসিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর গ্রামে পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে এসে এক জমায়েতের আয়োজন করে। লক ডাউনের মধ্যে জমায়েত হওয়ার প্রতিবাদ করায় স্থানীয় এক ডাক্তারবাবুর বাড়ি-সহ ১২ টি দোকান ভাঙচুর করে লুঠপাট করে মুসলমানরা। এরপর গ্রামের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে চড়াও হয়ে মূর্তি ভেঙে প্রণামী বাক্স থেকে টাকা ও গহনা লুঠ করে তারা।

চণ্ডীপুর গ্রামের বাসিন্দা হরেন দাস ও দেবাশিস দাস জানান, কয়েকদিন আগে পাশের গ্রামের একজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। সেজন্য গ্রামবাসী গ্রামে ঢোকার রাস্তা ঘিরে দেন। কিন্তু পাশের গ্রামের মুসলমানরা জোর করে গ্রামে আসা-যাওয়া করতে থাকে। প্রথমে ডাক্তারবাবু ভাবেশ দাস এর প্রতিবাদ করেন। এছাড়া, ফিরে আসা শ্রমিকরা সর্দি-জ্বর নিয়ে তাঁর চেম্বারে এলে তিনি তাদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অভিযোগ,একারণেই সেদিন সন্ধ্যায় চণ্ডীপুরৈর আশেপাশে গ্রামের মসজিদ থেকে মাইকে ভিড় জমা করে কয়েকশো জেহাদি লাঠি,বল্লম, অস্ত্র-সহ ডাক্তারবাবুর চেম্বার সহ ১২টি দোকানে হামলা চালিয়ে লুঠপাট করে। এক হিন্দু চা-ওয়ালকে প্রচণ্ড মারধর করে।

প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে হামলা চলার পর পুলিস আসে। কিন্তু ততক্ষণে হিন্দুদের যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। পুলিশ ৪ জন জেহাদিকে গ্রেপ্তার করলেও হিন্দুরা ক্ষোভে ফুঁসছে। পরেরদিন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, জেলা বিজেপি সভাপতি গোবিন্দ মণ্ডল-সহ একটি দল চণ্ডীপুর গ্রামে রওনা হলে পুলিশ তাঁদের রাস্তায় আটকায়। মালদা জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তি হবে বলে জানিয়েছেন। রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এই ঘটানায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলা প্রসাসনকে উপযুক্ত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সব মিলিয়ে করোনা সংকটের সময় জেহাদি তাণ্ডবে মালদা জেলা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে।

হয়। কিন্তু সেই ঘটনা বেশিদূর এগোয়নি। এরপরে সন্ধ্যেয় বৃষ্টি নামে। স্থানীয়রা সবাই নিজের নিজের বাড়িতেই ছিলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিত আক্রমণ শুরু হয় তাদের উপর। আঘাত হানা হয় মন্দিরে। ভাঙচুর করা হয় বেশ কিছু দোকান, বাড়ি। প্রথমটায় অকস্মাৎ আক্রমণের অভিঘাতে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। নিজেদের শ্রমিক কলোনির বাড়ি ছেড়ে তারা আশ্রয় নেয় জুট মিলগুলিতে। আক্রমণকারীরা একে নিজেদের জয় ভেবে নিয়ে আরও দ্বিগুণ উল্লাসে আক্রমণ শুরু করে। মুহুর্মুহু বোমাবাজি শুরু হয় এলাকায়। কিন্তু এই পুরো পর্বে কোথাও পুলিশের দেখা পাওয়া যায়নি।

এই সময় স্থানীয়রা প্রাথমিক আক্রমণের আকস্মিকতা সামলে নিয়ে নিজেরাও পালটা আক্রমণ করে আত্মরক্ষার্থে। এবার পুলিশের দেখা পাওয়া যায়। পুলিশ পথে নামে এবং গ্রেপ্তার করে বেশ কিছু স্থানীয় যুবককে। তাদের অপরাধ, তারা আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ করছিল। উলটোদিকে যারা বোমাবাজি করছিল, মন্দিরে আক্রমণ করেছিল তারা নির্বিঘ্নে ফিরে যায় নিজের এলাকায়।

এর পরেরদিন পরিস্থিতি শান্ত ছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তী মুসলমান এলাকার এক শাসক দলের নেতার নেতৃত্বে জমায়েত হয় এবং সেই জমায়েতে ঘোষণা করা হয় তারা পরেরদিন সকালে এক প্রতিবাদ মিছিল বার করবেন। পরের দিন সকালে প্রতিবাদ মিছিলের নামে পুরো এলাকায় শুরু হয় তাণ্ডব। মুহুর্মুহু ধর্মীয় স্লোগান তুলে তারা শ্রমিক কলোনির একের পর এক বাড়িতে আক্রমণ শুরু করে। বোমার ধোঁয়ায় ভরে যায় এলাকা। বেশ কিছু দোকানে আগুন লাগানো হয়। আমরা অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিয়োতে দেখেছি কীভাবে বহুদূর পর্যন্ত সেই কালে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই পুরো ঘটনার সময় পুলিশ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। বরং আবারও যখন স্থানীয়রা আত্মরক্ষার্থে নামেন তখন পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই অভিযোগ খুব অসত্য বলে মনে হয় না যখন দেখি পুলিশ কমিশনার স্থানীয় সাংসদের ফোন ধরার মতো শিষ্ঠাচারটুকু দেখাচ্ছেন না। এখনও পর্যন্ত ঘটনা সম্বন্ধে যেটুকু বর্ণনা দিয়েছি সেসবই স্থানীয় সূত্রে নানা অভিযোগ এবং প্রতি অভিযোগ। কিন্তু সেই অভিযোগ, পালটা অভিযোগের জাল ছিন্ন করে সত্য ঘটনা প্রকাশ করার দায়িত্ব যাদের তাদের হতাশজনক ভূমিকা দেখে মনে হয় না প্রকৃত সত্য কোনো দিনই জানা যাবে। বিশেষত যখন অভিযুক্তের বাড়িতে চাল, ডাল পৌঁছে দেওয়াটাই এখন দস্তুর এই রাজ্যে।

তেলিনীপাড়ার মানুষদের দাবি অযৌক্তিক নয়। তারা এই অতিমারীর সময়ে নিজেদের এবং পরিবারের সুরক্ষার কথাটুকু ভাবতে চেয়েছেন শুধু। সেই ভাবনা থেকে সরকারের নির্দেশানুসারে লকডাউন এবং সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিংকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাদের বোধহয় সেই অধিকারটুকুও নেই। সেই কারণে যখন তারা আক্রান্ত, পুলিশ মুখ ঘুরিয়ে থেকেছে। আর যখন তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে তখন পুলিশ তাদের উপরেই জুলুম করেছে। এই অবিচারের শেষ কোথায় তা আমরা কেউ জানি না। শুধু এটুকুই আমরা জানি যে আমাদের সহ্যের সীমা খুব দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় সবার, বিশেষত প্রশাসনের শুভবুদ্ধির উদয় ঘটবে এই আশাই আমরা রাখতে পারি। তা নাহলে সামনের সময় অত্যন্ত অন্ধকার। আমরা এখনও আশা রাখি প্রশাসন নিরীহ নির্দোষ মানুষকে নয়, প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করে সত্য ঘটনা প্রকাশ করবে। ইন্টারনেট বন্ধ করে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা না করে ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করবে। ▫

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ উন্মোচিত হোক

রঞ্জন কুমার দে

মহারাষ্ট্রের পালঘরে মবলিংচিঙের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হলো কল্পবৃক্ষ গিরি (৭০), সুশীল গিরি মহারাজ (৩৫) এবং তাঁদের ড্রাইভার নিলেশকেও। ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম আধ ডজন পুলিশের উপস্থিতিতে কোনো ধর্মীয় গুরুদের ভিড়ে ঠেলে দিয়ে আঘাতে আঘাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বারবার আকুতি-মিনতি করে বলছেন ঘটনাটিতে সাম্প্রদায়িক রং না দিতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঠাকরে কি সত্যি নিরপেক্ষ ছিলেন! তাহলে নৃশংস ঘটনাটি ১৬ এপ্রিলের রাতে ঘটলেও কেন ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল, কোনো প্রকার গ্রেপ্তার তখন কেন করা হয়নি? অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ১৯ এপ্রিল ঘটনাটি ভাইরাল হলে মহারাষ্ট্র সরকার ১০৯ জনকে গ্রেপ্তার করে ডেমেজ কন্ট্রোলের মাত্র চেষ্টা করে। অথচ ঘটনাস্থল থেকে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির দূরত্ব মাত্র কয়েক ক্রোশের থাকলেও পুলিশের পৌঁছাতে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লেগে যায়। তারপরও যখন ভিড় পুলিশের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন পুলিশ কেন লাঠিচার্জ, খোলা ফায়ারিং বা অতিরিক্ত বাহিনী ডাকেনি? স্পর্শকাতর এই এলাকাটিতে আগে ধর্মান্তকরণ, মাওবাদী গতিবিধির মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও এভাবে ট্রিপল মার্ডার হয়নি। জানা যাচ্ছে এটা এক খ্রিস্টান মিশনারি এলাকা । তাই হিন্দু সন্ন্যাসীদের আর শেষ রক্ষা হয়নি। গ্রেপ্তার হওয়া ১০৯ জনের অধিকাংশই খ্রিস্টান ও কমিউনিস্ট। নাম-পদবিতে এদের হিন্দু মনে হলেও এরাই সেই ঘটনা ঘটিয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া জয়রাম ধাক ভাবর, মহেশ সীতারাম রাবনে, গণেশ দেবজিরাও, রামদাস রূপজি, সীতারাম চৌধরীদের নাম হিন্দুদের মতো হলেও এরা ধর্মান্তরিত কমিউনিস্ট এবং হিন্দু বিদ্বেষী। অনেকটা কমিউনিস্ট নেতা সীতারাম ইয়েচুরির মতো। সিরাজ বালসারা নামের এক খ্রিস্টান মিশনারি পুলিশ হেফাজতে দুষ্কৃতীদের জামিনের জন্য লড়ছে। উল্লেখ্য, স্থানীয় বিধায়ক কমরেড বিনোদ নিকোলে

ভারতের বুদ্ধিজীবীরা মবলিনচিংয়ের ঘটনাগুলোর নির্বাচনপটু (সিলেক্টিভ) প্রতিবাদ করেন। এইরকম মবলিংনচিং ঘটলে প্রথমে আক্রান্ত ব্যক্তির ধর্ম যাচাই করে যদি মুসলমান হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ হাতে প্লেকার্ড নিয়ে রাজপথে নেমে পড়েন। সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদী, বিজেপি, আর এস এসকে টার্গেট করে মুণ্ডপাত করা হয়। যদি আক্রান্ত ব্যক্তি হিন্দু হন তাহলে মূক -বধির সেজে বসে থাকেন। মহারাষ্ট্রের পালঘর মবলিনচিং সেই একই ফর্মুলার প্রতিফলন।

কমিউনিস্ট নেতা হওয়ায় সন্দেহ আরও গভীর হচ্ছে।

ভারতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতাতে কমিউনিস্টদের সমস্যা যুগ যুগান্তরের। পালঘর হত্যাকাণ্ড মনে করে দেয় ২০০৮-এ কেরলের কমিউনিস্ট সংগঠন Democratic Youth Federation of India (DYFI) -র সদস্যদের সেখানকার সাধু-সন্তদের উপর নির্মম অত্যাচারের। সেই সময় কেরলে সন্তোষ মাধবন নামের এক ভুয়ো সন্ন্যাসী নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হলে DYFI-এর সদস্যরা পুরো রাজ্য জুড়ে সাধুসন্ত নিধনে মেতে উঠে। তাহারা খুঁজে খুঁজে সন্ন্যাসীদের আশ্রমে তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। জোর করে তাঁদের চুল-দাড়ি, জটা কেটে দেওয়া হয়। কেরলের কান্নুড় জেলায় সাধু বিনোদ নামের এক সন্ন্যাসীকে মিথ্যে (যেটি পরে মিথ্যা প্রমারিত হয়) অপবাদে কমিউনিস্টরা তাঁকে শারীরিক হেনস্থা করে। তাঁরও চুল, দাড়ি কেটে দেওয়া হয়। সাধু বিনোদ এক সাক্ষাৎকারে জানান শারীরিক অত্যাচারে এতটুকু কষ্ট হয়নি যতটুকু তাঁর লাইব্রেরি জ্বালিয়ে দেওয়াতে কষ্ট হয়েছিল। কারণ লাইব্রেরিতে প্রায় ষোলো হাজারেরও বেশি আধ্যাত্মিক পুস্তক ও অন্যান্য তথ্যাদি ছিল। তারপরও এই সাধুর আখড়ায় নকশালরা ত্রিশবারেরও বেশি ভাঙচুর চালায়। কিন্তু তিনি পালিয়ে যাননি, বরং বিশ্বাস করতেন যে এই পথভ্রষ্টরা একদিন ঠিক পথে ফিরে আসবে। একসময় পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্টদের শক্ত গড় ছিল। পালঘর হত্যাকাণ্ডের একই কায়দায় বিজন সেতু হত্যাকাণ্ডের ছক কষা হয়েছিল। ১৯৮২-র ৩০ এপ্রিল, কলকাতার তিলজলাতে আনন্দমার্গের একটি ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনে যাওয়ার পথে ১৭ জনের একদল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে ছেলেধরা গুজবে সিপিএম ক্যাডাররা দিনের প্রহরে মাঝরাস্তায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারে । পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী সিপিএম ক্যাডাররা ওইদিন বিভিন্ন এলাকায় ছেলেধরা গুজব ছড়িয়ে রাখে। তাই সন্ন্যাসীদের কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিজন সেতুর বন্ডেল গেটে সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে চরম নির্মমতায়

পালঘর হত্যাকাণ্ডের মৃত ড্রাইভার নিলেশের পরিবারকে কত টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে?। কোনো রাজনৈতিক নেতা ওই পরিবারে গিয়ে নিলেশের স্ত্রী, সন্তানদের সান্তনা দিয়েছে কি! প্রকৃতপক্ষে এটাই বর্তমান ভারতবর্ষের সেকুলারিজমের নগ্ন চিত্র।

তাঁদের ট্যাক্সি থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে শাবল দিয়ে মাথা থেঁতলিয়ে দেওয়া হয়, ছোরা দিয়ে চোখ উপড়ে শরীরে পেট্রোল ঢেলে জ্যান্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। ঘটনাস্থল থেকে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির হেঁটে দূরত্ব প্রায় পাঁচ মিনিটের হলেও আশ্চর্যজনকভাবে দিনদুপুরে ঘটে যাওয়ার এক ঘণ্টার নরসংহারে পুলিশের সামান্যতম তৎপরতা চোখে পড়েনি। তৎকালীন নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু সাধু হত্যাকাণ্ডটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে বিবৃতি দিয়ে নিজের দায় এড়িয়ে যান। তাদের রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাসগুপ্তের মন্তব্য কেবল ছিল ঘটনাটি সাধারণ জনগণ ঘটিয়েছে। বিভিন্ন তথ্যানুযায়ী বিজনসেতু হত্যাকাণ্ডের রোডম্যাপ তৈরি হয়েছিল ১৯৮২-র ৬ ফেব্রুয়ারি ক্ষমতাসীন শাসক বামেদের পিকনিক পার্কে ডাকা কনভেনশনে। সেদিনের মিটিঙে বাম নেতা কান্তি গাঙ্গুলি (তৎকালীন কমিশনার যাদবপুর পৌরসভা ও প্রাক্তন মন্ত্রী), সুজন চক্রবর্তী, মিহির চট্টোপাধ্যায় (নাট্যকার), আশুতোষ সেন (অ্যাডভোকেট), কবি অরুণ মিত্র, সুনীল চক্রবর্তী (চেয়ারম্যান যাদবপুর পৌরসভা), প্রণব সেন (কমিশনার) প্রমুখ আনন্দমার্গের সাধুসন্তদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণে উপস্থিত সবাইকে উত্তেজিত করেছিলেন। হত্যাকাণ্ডটির চূড়ান্ত ছক কষা হয় সেই বছরের ২৯ এপ্রিল কান্তি গাঙ্গুলির সভাপতিত্বে সিপিএম ক্যাডারদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কর্মীদের দায়িত্ব বণ্টনে। সিদ্ধান্তনুযায়ী আনন্দমার্গের সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে মিছিল করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে রাখা হয়। ঘটনার দিন ক্যাডারবাহিনী প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি মজুত রেখে বিজনসেতু, বালিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন এবং বালিগঞ্জ রেলওয়ের জিনিসপত্র রাখার স্থানে নানা দলে বিভক্ত হয়ে লুকিয়ে থাকে। সেই অনুযায়ী নিরস্ত্র সন্ন্যাসীরা তিলজলার আশ্রমে পৌঁছতেই লুকিয়ে থাকা কমিউনিস্টরা ইতিহাসের অন্যতম নারকীয় হত্যাকাণ্ডটি ঘটায় । দুঃখের কথা, ৩৮ বছরেও সেই আনন্দমার্গীরা কোনো ন্যায় পাননি, বরং তাঁরা আজও সেই একই চক্রান্তের শিকার। পরিবর্তনের ডাকে সাড়া দিয়ে মমতা ব্যানার্জি ঘটা করে বিচারপতি লালার নেতৃত্বে হত্যাকাণ্ডটির যে কমিশন বসিয়েছিলেন, অদৃশ্য ইঙ্গিতে আজও তা তিমিরে। দেশের বামপন্থী এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা দিন-রাত্রি বিজেপি-আরএসএসের বিষোদ্গার করলেও তারা নিজেরাই জানে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্টরাই ফ্যাসিবাদের মূর্তিমান প্রতীক।

অধুনা নওমুসলিম কবির সুমন ঢাকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ১৯৯৯ সালের ২৩ জানুয়ারি ওড়িশাতে অস্ট্রেলিয়ান খ্রিস্টান পাদরি গ্রাহাম স্টেইনের হত্যাকাণ্ডের দিনই তিনি নাকি ধর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত স্থির করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। স্থানীয় গরিব বনবাসীদের সঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারিদের সংঘাতই ছিল তারর মুখ্য কারণ। আক্ষেপ সেদিনের বিজনসেতু হত্যাকাণ্ডে এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, ধর্মনিরপেক্ষর ধ্বজাধারীরা যেমনটি করে মুখে কুলুপ দিয়ে রেখেছিল, পালঘরে সাধুহত্যায় তারা একই ভূমিকা পালন করছে। কমিউনিস্টদের হিন্দু দেব-দেবী, সাধুসন্ত, পূজাপার্বণে আপত্তি থাকলেও বাকি সব ধর্মে তাদের কোনো

সমস্যা নেই, হওয়ার কথাও নয়। উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে দুষ্কৃতীরা আখলাককে পিটিয়ে হত্যা করলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কল্যাণে ভারত অচানক অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। পুরস্কার ফেরত গ্যাংদের অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। আখলাকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকারি চাকরি, ফ্ল্যাট, এককালীন কোটি টাকার সাহায্য কোনো কিছু বাদ যায়নি। কিন্তু কেউ কি বলতে পারবে পালঘর হত্যাকাণ্ডের মৃত ড্রাইভার নিলেশের (৩০) পরিবারকে কত টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে?। কোনো রাজনৈতিক নেতা ওই পরিবারে গিয়ে নিলেশের স্ত্রী, সন্তানদের সান্তনা দিয়েছে কি! প্রকৃতপক্ষে এটাই বর্তমান ভারতবর্ষের সেকুলারিজমের নগ্ন চিত্র। আরও আশ্চর্যের, যখন জুনেদ নামের এক যুবক ট্রেনের আসন নিয়ে ঝগড়ায় সহযাত্রীর ছুরিকাঘাতে মারা গেলেও তাতে সাম্প্রদায়িকতার রং ঢালার অপচেষ্টা এখন পর্যন্ত চলছে।

ভারতের বুদ্ধিজীবীরা মবলিনচিংয়ের ঘটনাগুলোর নির্বাচনপটু (সিলেক্টিভ) প্রতিবাদ করেন। এইরকম মবলিংনচিং ঘটলে প্রথমে আক্রান্ত ব্যক্তির ধর্ম যাচাই করে যদি মুসলমান হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ হাতে প্লেকার্ড নিয়ে রাজপথে নেমে পড়েন। সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদী, বিজেপি, আর এস এসকে টার্গেট মুণ্ডপাত করা হয়। যদি আক্রান্ত ব্যক্তি হিন্দু হন তাহলেও তার জাত দেখা হয়। দলিত হলে টার্গেট সেই মোদী, বিজেপি, আরএসএস, ব্রাহ্মণ, হিন্দুত্ববাদীরা। আবার সেই হিন্দু ব্যক্তি দলিত না হলে যাচাই করা হয় ঘটনাটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে কি না, যদি হয় তাহলেও টার্গেট মোদী সরকারেব দুর্বল প্রশাসন। তবে সেই আক্রান্ত ব্যক্তি অবিজেপি শাসিত রাজ্যে হলে সহজ ফর্মূলা মুখে কুলুপ আঁটা। মহারাষ্ট্রের পালঘর মবলিনচিং সেই একই ফর্মুলার প্রতিফলন। সম্প্রতি এক মার্কিন সংস্থা 'United State Commission on International Religious Freedom' (USCIRF) ২০২০ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্থিতি খুবই চিন্তাশীল। উল্লেখ্য, এই তালিকাতে ভারতের সমান্তরালে রাখা হয়েছে পাকিস্তান, চীন, উত্তরকোরিয়া, সিরিয়ার মতো অশান্ত, মৌলবাদী, একনায়ক দেশ সমূহ। কারণ সহজেই অনুমেয়, বিশ্ব দরবারে ভারতরে ছোটো করা। পাকিস্তান আপদমস্তক একটা মৌলবাদী জঙ্গির মদতদাতা দেশ, যারা করোনা মহামারীতেও দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ত্রাণে বঞ্চিত রাখে, সংখ্যালঘু নাবালিকাদের বলপূর্বক অপহরণ, ধর্ষণ ও ধর্মান্তকরণের পিশাচ নৃত্যে মেতে আছে। অপরদিকে ভারত পৃথিবীর একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিল, আইন প্রণয়নে কারো সঙ্গে ভেদভাব করা হয় না। বিরোধী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রাণখুলে সরকারের বিরোধিতা করতে পারে। আশ্চর্যজনকভাবে USCIRF রিপোর্টে চরম সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয়েছে, অথচ সেই দেশে করোনা ভাইরাসের সুযোগে ধর্মীয় মৌলবাদীরা প্রতিদিন দেশের কোনো না কোনো জায়গায় হিন্দু নির্যাতনে লিপ্ত। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের মাইনরিটি ওয়াচ বোর্ডের রিপোর্টনুযায়ী গত এপ্রিল মাসের ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯ তারিখে হিন্দুদের উপর হামলা, বাড়িঘর জ্বালানি, জবরদখল, ধর্ষণ, খুন প্রভৃতি অপরাধমূলক কাণ্ড সংগঠিত হয়। এরপরও হায়, মার্কিন রিপোর্টে এরা সহিষ্ণু দেশ!

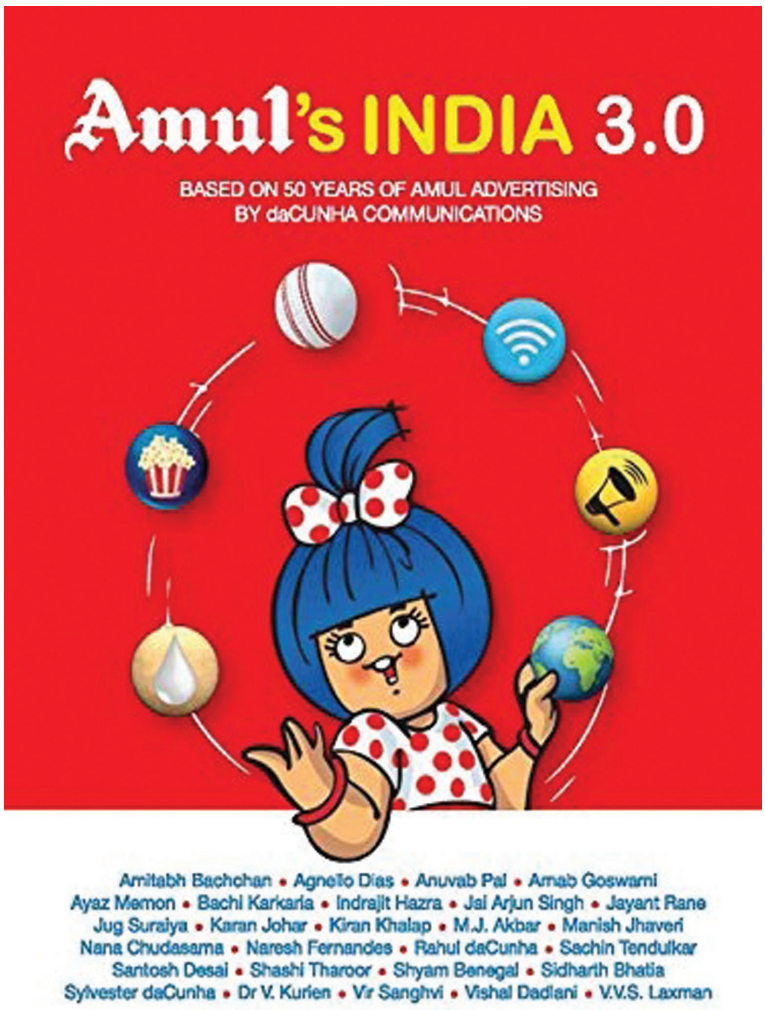

অতিথি কলম

করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়তে দেশজুড়ে জেলা আধিকারিকদের বড় ভূমিকা

ডাঃ দেবী শেঠী ও কিরণ মজুমদার শ'

এক বিশাল সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলার চেয়ে ছোটো ছোটো অজস্র সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে বললে বুঝতে সুবিধে হয়। পর্যবেক্ষণটি করেছিলেন আমেরিকান বিশ্ববিখ্যাত শিল্প পরিচালক হেনরি ফোর্ড। নানান মহা সংকটকালের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। একলপ্তে ৬০ হাজার কোভিড আক্রান্ত রোগীর পরিচর্যা করা ভারতের কাছে নিশ্চিত বড়ো সমস্যা। কিন্তু এই সংখ্যাটিকেই ভারতের ৭৩০টি জেলার নিরিখে ১০০ থেকে ২০০-র মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে ভাগ করে যদি নজর দেওয়া যায় তাহলে সমস্যাটা অনেক ছোটো আকারের মনে হতে পারে। ফলে একে ম্যানেজ করাও অনেক সহজ হতে পারে। আমার মতে ১৭ মে'র পর লকডাউন তোলার ক্ষেত্রে ভারতের এটিই উপযুক্ত পরিকল্পনা হওয়া উচিত। হ্যাঁ, জেলা প্রশাসনকে ঘিরেই ঘটবে যা কিছু করোনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড। এই জেলা প্রশাসন কার্যালয়ই হবে প্রাণকেন্দ্র। আমি বিশ্বাস করি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুরুতেই লকডাউন ঘোষণা করার ফলশ্রুতিতে অন্তত ৫০ শতাংশের ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করবে নির্দিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি কীভাবে তাঁদের Containment পরিকল্পনাকে বাস্তবে সফলভাবে রূপায়িত করতে পারছে।

এই প্রসঙ্গে বলা ভালো যে ভারতকে কখনই একটি এক ছাঁচে ঢালা দেশ হিসেবে ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

কোভিডের প্রার্দুভাবের ক্ষেত্রে ভারতের গতিপ্রকৃতির অনেকটাই ইউরোপের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে। সেখানে কোনো কোনো দেশে সংক্রমণের মাত্রা তুলনামূলকভাবে অন্য ইউরোপীয় পড়শি দেশের থেকে কম। একইভাবে ভারতের ক্ষেত্রে কেরালা, কর্ণাটক, গোয়া প্রভৃতি রাজ্যে রোগীর সংখ্যা অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় কম হবে।

জেলাস্তরে গুরুত্ব ঃ লকডাউন তার উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়েছে। এই সময়ে রাজ্য সরকারগুলি তাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে কোভিড আক্রমণ ঠেকাতে যথাসাধ্য করেছে। কিন্তু লকডাউন উঠে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে রোগের সংক্রমণ যে বেশ বাড়বে এমনটা ধরে নিয়েই আমাদের কিন্তু প্রস্তুত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ হবে রাজ্যে রাজ্যে ফিরে আসা সেই পরিযায়ী শ্রমিকেরা যারা আপাততভাবে রোগলক্ষণহীন হলেও অনেকে বাস্তবে শরীরে রোগ বহন করছে। এরা কর্মসূত্রে মেট্রো শহরগুলি থেকে নিয়ে আসা জীবাণু গ্রামে ছড়িয়ে দিতে পারে। লকডাউন পরবর্তী পর্বে সফলভাবে আক্রান্তের সংখ্যা কমাতে গেলে অত্যন্ত আগ্রাসীভাবে পরীক্ষা, অনুসন্ধান ও নির্দিষ্ট সময় নজরদারি করা ছাড়া পথ নেই। পরিকল্পনাটি রূপায়িত করতে গেলে রাজ্যগুলিকে জেলাভিত্তিক নির্দিষ্ট ছক তৈরি করতে হবে।

> **ভারতে তরুণ জনসংখ্যার আধিক্য, সেই দিক থেকে আমাদের অনুকূলে রয়েছে। আমরা যত বেশি সংখ্যক পরীক্ষা করতে পারব পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী আমাদের মৃত্যুহার তত কম হওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে।**

প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে একটি করোনা সংক্রান্ত ওয়ার্ডরুম তৈরি করা যেখানে জেলা প্রশাসনগুলি প্রতি সন্ধ্যায় সর্বশেষ পরিস্থিতির রিপোর্ট করবে। এই সূত্রে সহজে খোঁজ পাওয়ার জন্য একটি Tracking App খুলতে হবে যেমন কর্ণাটকে করা হয়েছে। এখানে এক মুহূর্তেই রাজ্যের প্রতিটি জেলার করোনা সংক্রান্ত খবর পাওয়া যাবে। জেলাগুলির পরিস্থিতি কেমন তা বুঝতে চারটি মানদণ্ড হবে ভিত্তি — (১) কতগুলি পরীক্ষা হয়েছে, (২) কত পরীক্ষা নেগেটিভ হলো, (৩) সেই দিন কত জন মারা গেলেন, (৪) যারা নজরবন্দি অবস্থায় অন্তবর্তী সময় কাটাচ্ছেন তাদের সন্তুষ্টি মতামত কেমন। মনে রাখতে হবে, রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষায় সংক্রামিতের সংখ্যা বাড়লে জেলা আধিকারিককে তিরস্কার করলে তাঁর পক্ষে পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানোর কোনো তাগিদ থাকবে না।

পরীক্ষা, অনুসন্ধান, নজরদারি ঃ প্রত্যেক জেলায় নিদেনপক্ষে দু'টি সংক্রমণ পরীক্ষাগার থাকা দরকার। যার মধ্যে PCR Machine থাকা আবশ্যিক। বিকল্প হিসেবে প্রতিটি জেলাকে কাছাকাছি অবস্থিত সরকার স্বীকৃত অন্য কোনো পরীক্ষা ল্যাবরটরির সঙ্গে সংযুক্ত থাকা জরুরি। প্রত্যেকটি পরীক্ষাকেন্দ্রকে কমপক্ষে দৈনিক ২৫০টি পরীক্ষা করতেই হবে। একই সঙ্গে যদি নিয়মাবলী মেনে অনেকের রক্তে নমুনা মিশিয়ে Pool test বা সমষ্টিগত পরীক্ষা করা যায় সেক্ষেত্রে এক লপ্তে ৫ গুণ একসঙ্গে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এমন ব্যক্তি যাদের ইনফ্লুয়েনজার মতো জ্বর বা প্রবল শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করা উচিত। অন্যদিকে ওষুধের দোকানগুলি থেকে যারা জ্বর ও কাশি সংক্রান্ত ওষুধপত্র কিনে নিয়ে গেল সেই তালিকা ধরে পরীক্ষা হওয়া জরুরি।

রোগলক্ষণ নজরে পড়ছে না কিন্তু পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে এমন মানুষদের

সরাসরি হাসপাতালে ভর্তি না করে হোটেল বা কোনো হোস্টেলে রাখা উচিত। যে কেউ অন্য কোনো স্থান থেকে জেলায় ঢুকছে বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের ১৪ দিন বাধ্যতামূলক নজরবন্দি গৃহে রাখা দরকার। তাদের অতিথি হিসেবে রাখতে হবে। ভালো খাবারদাবারের সঙ্গে Mobile wifi সুবিধে দিতে হবে (যাদের মোবাইল আছে)। এর কারণ হচ্ছে এর মাধ্যমে যেন বার্তা যায় যে নজরবন্দি থাকার বিষয়টা মোটেই যন্ত্রণাদায়ক নয়, বরং আরামপ্রদ। এ কারণে প্রত্যেক জেলায় ২০০ কামরার হোটেল বা হোস্টেল রাখতে হবে যেখানে লক্ষণহীন রোগীরা নজরবন্দি অবস্থান করবেন। অবশ্যই নিজগৃহে নজরবন্দি অবস্থান অনায়াসে করা যেতে পারে যেমন আলাদা থাকার ঘর ও লাগোয়া শৌচাগার রয়েছে। এই মডেলে কাজ করলে আমাদের হাসপাতালগুলিও উপচে পড়ে সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে দেওয়া অনেকটা আটকাতে পারবে।

প্রত্যেক জেলায় একটি করে কোভিড সংক্রান্ত আলাদা ২০০ শয্যার ICU যুক্ত হাসপাতাল থাকা দরকার। যেখানে বিশেষজ্ঞ অ্যানাস্থেটিস্ট, নার্স ও প্যারামেডিক থাকবেন। অবশ্যই ভেন্টিলেটর ও পর্যাপ্ত Personal Protective Equiopment (PPE বা বর্মবস্ত্র) থাকতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলি যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক স্নাতকোত্তর শিক্ষানবীশ ডাক্তার রয়েছেন এক্ষেত্রে এগুলি আদর্শস্থান হতে পারে। কোভিডের সঙ্গে এই যুদ্ধ তরুণ টগবগে ডাক্তাররাই জিততে পারেন বিশেষ করে যাদের অ্যানসথেসিয়া ও ICU-তে কাজ করার প্রশিক্ষণ রয়েছে। কোভিড সংলগ্ন ICU প্রবীণ ডাক্তারবাবুদের কাজের পক্ষে বিপজ্জনক স্থান।

সহজে আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি প্রবীণদের রক্ষা ঃ কোভিড আক্রন্ত হলেই কাউকে সামাজিকভাবে অচ্ছুত করে দেওয়ার সমস্যাগুলির নিরসন দরকার। সমাজের এই শিক্ষাটুকু নেওয়ার সময় এসেছে। যেসব রোগী সেরে উঠেছে তাদের ব্রাত্য করে রাখা অপরাধ। সব ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সমাজকর্মী ও স্থানীয় মানুষজনদের প্রবীণ অক্ষম মানুষের বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, আবশ্যিক সামগ্রী সরবরাহে সব রকমের সহযোগিতা করা উচিত যাতে তাঁরা অসহায় না বোধ করেন।

বাজার বা যে কোনো জনবহুল অঞ্চলে প্রয়োজনে যেতে গেলে মাস্ক পরা ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এগুলিকে কড়া হাতে বলবৎ রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শপিং মল, ধর্মীয় প্রার্থনালয়গুলি বন্ধ থাকবে। সব ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান এখন বন্ধ রাখতে হবে। স্কুল-কলেজের জন্য অনলাইন শিক্ষা প্রদানই চলবে। তবে মহামারীরোধে এই প্রচেষ্টায় প্রশাসনকে সফল হতে গেলে সমাজের সকলের সহযোগিতা ও যাঁরা সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন তাঁদের বিশ্বাস অর্জন জরুরি। একেবারে গোটা অঞ্চলকে hot spot করে দীর্ঘদিন অচল রাখলে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তেই থাকবে, বরঞ্চ ঠিক যেখানে Positive রোগী ধরা পড়ছে সেই নির্দিষ্ট কয়েকশো মিটার অঞ্চল চিহ্নিত করে কড়াকড়ি করতে হবে। বস্তি অঞ্চলে যেখানে অনেকে পজিটিভ রোগীর সঙ্গে একই শৌচালয় ব্যবহার করছেন তাদের অবশ্যই তুলে নিয়ে নজরবন্দি করতে হবে। এলাকার দোকান সকাল থেকে রাত অবধি সামাজিক দূরত্ব মেনে খোলা থাকুক।

কোভিড ছাড়া অন্য রোগীরা যাতে চিকিৎসা পায় সে ব্যবস্থা করতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলি স্বাভাবিক কাজকর্ম অচিরে শুরু করুক। অন্তঃরাজ্য রেল,বিমান ও সড়কপথে যাত্রী পরিবহণ চালু করে দেওয়ার সময় এখনও হয়নি। মাল বা অন্য সামগ্রী যেমন চলাচল করছে চলুক।

মৃত্যুর সংখ্যা আটকানো ঃ জেলা প্রশাসনকে পরিকল্পনায় একটা মূলগত ধাঁচা দিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী ফলদায়ী ব্যবস্থা নেবে। আবার বলছি মহামারী প্রকোপ স্থিমিত হয়ে এলে কোনো দেশকেই কত লোক আক্রান্ত হয়েছিল সেই ভিত্তিতে বিচার করা হবে না, তার কার্যপ্রণালীর সাফল্য বিচার হবে কত মানুষ মারা গিয়েছে সেই মানদণ্ডে। ভারতের তরুণ জনসংখ্যার আধিক্য সেই দিক থেকে আমাদের অনুকূলে রয়েছে। আমরা যত বেশি সংখ্যক পরীক্ষা করতে পারব পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী আমাদের মৃত্যুহার তত কম হওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে।

(ডাঃ শেঠী প্রখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জেন এবং চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা, নারায়ণ হেলথ। কিরণ মজুমদার শ' চেয়ার পার্সন, বাইকন লিঃ)

অনুবাদক-- সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

শোক সংবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক শ্যামল রায় চৌধুরী গত ২৯ এপ্রিল কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে

পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, একমাত্র পুত্র ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। তিনি বারুইপুরে স্বয়ংসেবক হন। এক সময় জেলার প্রচার প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মাধ্যমে জেলার বহু স্থানে সঙ্ঘের শাখা বিস্তার হয়। স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার-প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

****

ঝাড়গ্রাম জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক মৃণালকান্তি কর সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি তাঁর বাবা, মা, ২ ভাই, ১ বোন, সহধর্মিণী ও একমাত্র পুত্রকে রেখে গেছেন।

****

খড়্গপুর আইআইটি-র প্রবীণ স্বয়ংসেবক তরুণ চৌধুরী গত ৫ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ২ নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি সেবানিবৃত্ত সেনাকর্মী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন।